গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা ২৫ জুন, ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

পেট্রল-ডিজেল-গ্যাস-কয়লার মূল্যবৃদ্ধি

সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস সরকারের প্রথম উপহার

গত ১৪ জুন মাঝরাত থেকে আবার বাড়িয়ে দেওয়া হল পেট্রল-ডিজেল-রান্নার গ্যাস ও কয়লার দাম। দাম বেড়েছে পেট্রলে লিটার প্রতি ২ টাকা, ডিজেলে ১ টাকা, রান্নার গ্যাসে সিলিণ্ডার প্রতি ২০ টাকা ও কয়লায় প্রায় ১৭ শতাংশ। সি পি এমের পূর্ণ সমর্থনে ক্ষমতায় বসার পর কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত সংযুক্ত প্রগতিশীল জোট সরকারের পক্ষ থেকে দেশের মানুষকে প্রথম উপহার এই পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি।

কংগ্রেস সরকার মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণা করেই দায়িত্ব সেরেছে। বাকি যেটা থাকে, সেটা হল মূল্যবৃদ্ধির বোঝায় বিক্ষুব্ধ জনগণের ক্ষোভকে নানা স্তোকবাক্য ও মিথ্যাচারের সাহায্যে প্রশমিত করার চেষ্টা চালানো। এই দায়িত্বটাই 'প্রগতিশীল' কংগ্রেস সরকারের হয়ে পালন করতে নেমেছে সি পি এম।

সি পি এম নেতারা বলছেন, পূর্বতন বিজেপি সরকারের সময়ই দাম বাড়াবার কথা হয়েছিল, কিন্তু ওরা ভোটের দিকে তাকিয়ে তখন দাম বাড়ায়নি, তাই এখন কংগ্রেস সরকারকে দাম বাড়াতে হচ্ছে। অর্থাৎ বিজেপি সরকারের পথটাই কংগ্রেসকে নিতে হচ্ছে। এটাই যদি সত্য হয়, তাহলে বর্তমান কংগ্রেস সরকার পূর্বতন বিজেপি সরকার থেকে আলাদা কী করে?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়েই সি পি এম নেতারা বলছেন, বিজেপি থাকলে দাম অনেক বাড়তো, এখন কংগ্রেসের সরকার, বিশেষত তা সি পি এমের সমর্থনের উপর দাঁড়িয়ে আছে বলেই 'সামান্য দামবৃদ্ধি' হয়েছে। জনসাধারণ লক্ষ্য করুন, পেট্রলে ২ টাকা, ডিজেলে ১ টাকা বৃদ্ধিকে সি পি এম 'সামান্য বৃদ্ধি' বলছে। প্রশ্ন করুন, পশ্চিমবঙ্গে পরিবহনের ভাড়াবৃদ্ধি করার ব্যাপারে একই কথা সি পি এম মন্ত্রী ও নেতারা বলবেন তো ? এবার যে পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি করা হল, ইতিপূর্বে বহু দফায় এর কাছাকাছি, এমনকী এর থেকে কম পরিমাণেও পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ানো হয়েছিল। কিন্তু সেটাকেই অজুহাত করে রাজ্যের সি পি এম সরকার সকল প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে, প্রতিরোধকে লাঠির জোরে ভেঙে দিয়ে দফায় দফায় সকল পরিবহণের, এমনকী যে ট্রাম ডিজেল-পেট্রলে চলে না, তারও ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছে। যেজন্য কলকাতা শহরের ন্যূনতম ৩ টাকা বাস ভাড়া ভারতের অন্যান্য শহর থেকে ইতিমধ্যেই বেশি।

রান্নার গ্যাসে সিলিণ্ডার প্রতি ২০ টাকা মূল্যবৃদ্ধি মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের

তিনের পাতায় দেখুন

১৬ জুন কলকাতায় বিক্ষোভ জমায়েতে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির আদেশনামায় আগুন দিচ্ছেন কমরেড মানিক মুখার্জী

আমেদাবাদের হত্যাকাণ্ডের উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি জানালেন কমরেড নীহার মুখার্জী

আমেদাবাদে গত ১৫ জুন গুজরাট পুলিশ কর্তৃক চারজনকে বীভৎসভাবে খুন করার ঘটনার উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানিয়েছেন এস ইউ সি আই-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী। পুলিশের অভিযোগ, নিহত ব্যক্তিরা নাকি লস্কর-ই-তৈবার সঙ্গে যুক্ত এবং তারা নাকি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে হত্যার উদ্দেশ্যে এসেছিল। কমরেড মুখার্জী বলেছেন যে, অন্যান্যদের সঙ্গে ১৭ বছরের এক ছাত্রীর নৃশংস হত্যার ঘটনায় সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের বিবেক শিউরে উঠেছে এবং ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে গুরুতর সন্দেহের সৃষ্টি করেছে।

সেই কারণে তিনি গোটা ঘটনার উচ্চপর্যায়ের বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন, যাতে দেশবাসী প্রকৃত সত্য জানতে পারেন। তদন্তের ফলে যদি দেখা যায় যে, গুজরাটের সংখ্যালঘু নিধনযজ্ঞের নায়ক নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে ধূমায়িত বিক্ষোভ থেকে মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই গুজরাট পুলিশ এই সাজানো সংঘর্ষ ঘটিয়েছে, তাহলে এই জঘন্য অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।''

বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করতে হবে

সাংবাদিক সম্মেলনে ইউ টি ইউ সি-এল এস রাজ্য সভাপতি কমরেড সনৎ দত্ত

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর ১৪ জুনের সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড সনৎ দত্ত বলেন যে, দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে আমাদের দেশে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চালু বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণের নীতির পরিপূরক হিসাবে বিদ্যুৎ ক্ষেত্র সংস্কারের নামে পূর্বতন বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারের আমলে প্রণীত হয় বিদ্যুৎ আইন ২০০৩। উদ্দেশ্য — সরকারি কোষাগার ও শ্রমিকদের পরিশ্রমের বিনিময়ে গড়ে ওঠা রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলিকে ভেঙে বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের পথ প্রশস্ত করা, বিদ্যুতের সামাজিক পরিষেবার চরিত্র ধ্বংস করে বাজারের পণ্যে পরিণত করা এবং সেইসঙ্গে ব্যাপক কর্মী সংকোচন ঘটানো।

এই প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিল, রাজ্যে এই আইনের রূপায়ণ রদ এবং বিদ্যুতের দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির (অ্যাবেকা) নেতৃত্বে প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী নিজস্ব উদ্যোগে আন্দোলন গড়ে তোলার পাশাপাশি এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছে এবং তাতে সক্রিয় অংশ নিয়েছে।

কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ 'পর্যালোচনা' করার কথা ঘোষণা করেছে। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর দৃঢ় অভিমত ঃ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দাবি বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ সংশোধন নয়, পুরোপুরি বাতিল। এই উদ্দেশ্যেই জনগণের আন্দোলন

ছয়ের পাতায় দেখুন

অনাহারে মৃত্যু ঃ মেদিনীপুরে এস ইউ সি আই-এর আইন অমান্যে পুলিশি লাঠিচার্জ, ১২ ঘন্টা শহর বন্‌ধ

গত ১৫ জুন এস ইউ সি আই মেদিনীপুর জেলা কমিটির ডাকে আমলাশোলে ৫ জন আদিবাসীর অনাহারে মৃত্যু সহ ঝাড়গ্রাম, বেলপাহাড়ী, শালবনী, গড়বেতা এলাকার বিভিন্ন গ্রামে বহু মানুষের অনাহারে মৃত্যুর প্রতিবাদে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাসক দপ্তরে আইন অমান্য করা হয়। প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে মেদিনীপুর রেলস্টেশন থেকে সহস্রাধিক মানুষের এক দৃপ্ত মিছিল শহর পরিক্রমা করে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে উপস্থিত হয়। সেখানে সংক্ষিপ্ত এক সভায় দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু এবং জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড পঞ্চানন প্রধান বক্তব্য রাখেন। কমরেড সৌমেন বসু বলেন, আমলাশোলের শুধু পাঁচজন নয় — সরকারি নীতির পরিণামেই এই জেলার পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে অসংখ্য মানুষ অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন এবং অসহায়ভাবে মারা যাচ্ছেন। আদিবাসী এবং

সাতের পাতায় দেখুন

১৫ জুন মেদিনীপুরে পুলিশের লাঠিচার্জ

সিনেমা এবং ভিডিও হলগুলিতে ব্লু-ফিল্ম দেখানোর প্রতিবাদে পুরুলিয়ায় বিক্ষোভ

পুরুলিয়া জেলা জুড়ে চলছে ব্লু-ফিল্মের অবাধ প্রদর্শন। শহর, গ্রাম কোথাও বাদ নেই। শহরের প্রধান প্রধান সিনেমা হলগুলিতে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলছে এই অশ্লীল সিনেমার রমরমা ব্যবসা। ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে গ্রাম-শহর সর্বত্র ভিডিও হল। কোন গ্রামে প্রাইমারি স্কুল বা হেল্‌থ সেন্টার একটিও না থাকতে পারে, কিন্তু ভিডিও হল থাকবেই এবং যা বহুক্ষেত্রে সরকারি লাইসেন্স প্রাপ্ত। অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর-কিশোরীরা বয়সের টানে 'নগ্ন' ছবিগুলির হাতছানিতে স্কুল-কলেজ থেকে পালিয়ে, ঘরের টাকা চুরি করে ভিডিও হলগুলিতে ভিড় জমায়। তার ফলস্বরূপ লেখাপড়ায় ব্যর্থতা এবং নানাধরনের চারিত্রিক বিকৃতি দেখা যায় এই কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে। এই অবস্থায় পুরুলিয়া শহরে ডি এস ও, ডি ওয়াই ও এবং এম এস এস এই অশ্লীল সিনেমা বন্ধ করতে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে নামে। সাধারণ মানুষ আন্দোলনের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানান। গত ২ মে ব্লু-ফিল্ম বন্ধের দাবিতে একটি মিছিল শহর পরিক্রমা করে। এই মিছিলে কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা ছিল লক্ষ্যণীয়। তারা থানার সামনে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এরপর এক প্রতিনিধিদল ভারপ্রাপ্ত এস আই-এর সঙ্গে দেখা করে জানান যে, অবিলম্বে প্রশাসন পদক্ষেপ না নিলে — তাঁরা অভিভাবক এবং ছাত্র-যুবকদের নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন মালবিকা চক্রবর্তী, সাবিত্রী মাহাতো, সুস্মিতা মাহাতো এবং অলক বসু।

(বামে) ডি এস ও'র মিছিল, (ডাইনে) এম এস এসের স্বাক্ষর সংগ্রহ

ভাড়াবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রতিরোধ করুন

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২১ জুন এক বিবৃতিতে বলেন, "সি পি এম সমর্থিত কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার কর্তৃক তেলের দাম বৃদ্ধিকে অজুহাত করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্বনিম্ন বাসভাড়া ৩ টাকার থেকেও অধিক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অথচ দিল্লি, আসাম, তামিলনাড়ু সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে এখনও সর্বনিম্ন বাসভাড়া ২ টাকা। এইভাবে বারবার ভাড়া বাড়িয়ে তথাকথিত উন্নততর বামফ্রন্ট সরকার যাত্রীস্বার্থে কাজ করে চলেছে! আমরা দাবি করছি ঃ (১) বাসভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে, (২) ডিজেলের উপর রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সেস্ এবং রোড ট্যাক্স ইত্যাদি প্রত্যাহার করতে হবে।

আমরা যাত্রী সাধারণকে যাত্রী কমিটি গঠন করে বাসভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রতিরোধ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

বিড়িশ্রমিক আন্দোলনের শহীদ স্মরণে সভা

গত ১২ জুন পালিত হল বিড়ি শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম শহীদ কমরেড মজিবর সেখ স্মরণ দিবস। ২০০২ সালের এই দিনটিতে মুর্শিদাবাদ জেলার সূতী থানার বৈষ্ণবডাঙ্গা গ্রামে প্রভিডেন্ট ফান্ডে গচ্ছিত টাকা ফেরতের দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন কয়েক হাজার বিড়ি শ্রমিক। মুন্সীদের পোষা গুণ্ডা ও পুলিশের মিলিত আক্রমণে পুলিশের গুলিতে নিহত হন এই বিড়ি শ্রমিক এবং গুলিবিদ্ধ হন আরো ছ'জন বিড়ি শ্রমিক। এর প্রতিবাদে ১৪ জুন মুর্শিদাবাদের সূতী ও বীরভূমের মুরারইতে সর্বাত্মক বন্‌ধ পালিত হয়। ১৫ জুন এস ইউ সি আই-এর আহ্বানে সারা রাজ্যে 'বিড়ি শ্রমিক শহীদ দিবস' পালিত হয়। ৩ জুলাই এ ঘটনার প্রতিবাদে কলকাতায় রানি রাসমণি রোডে বিরাট বিক্ষোভ মিছিল করে বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশন। আন্দোলনের চাপে অবশেষে প্রভিডেন্ট ফান্ডের দাবি আদায় হয়।

১২ জুন বহরমপুর গ্র্যান্ট হলে শহীদ মজিবর সেখ স্মরণ সভায় শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন সভার প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষাল, সভার সভাপতি কমরেড জয়নাল আবেদিন, বহরমপুর ও লালবাগ সাবডিভিশনাল বিড়ি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড আনিসুল আম্বীয়া, কমরেড অশ্বিনী মণ্ডল এবং ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পক্ষে কমরেড সুখেন্দু সেনগুপ্ত সহ আরো অনেকে।

ঐ দিন জঙ্গীপুর, ধুলিয়ান সহ জেলার বিভিন্ন স্থানে শহীদ স্মরণে মাল্যদান, সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

দেগঙ্গায় বাড়তি খাজনা ফেরত দিতে বাধ্য হল কর্তৃপক্ষ

গত ১৮ জুন '০৪ সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাসের নেতৃত্বে দেগঙ্গার কলসুর আর আই অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এই ডেপুটেশনে এলাকার বহু কৃষক অংশগ্রহণ করেন। সরকারের জনবিরোধী খাজনা নীতি ও বাগান, পুকুর প্রভৃতির উপর বাণিজ্যিক হারে খাজনা নেওয়ার বিরুদ্ধে কৃষকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। আর আই-কে ঘেরাও করা হয়। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কৃষকদের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় কৃষক বলাই সরদারের কাছ থেকে আদায়ীকৃত অতিরিক্ত ২৭৪ টাকা তৎক্ষণাৎ ফেরত দিতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়। তাছাড়া ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে আর আই প্রতিশ্রুতি দেন, বাগান, পুকুর প্রভৃতির উপর বেআইনি বাণিজ্যিক হারে খাজনা আদায় আর করবেন না। ইতিমধ্যে যে সমস্ত খাজনা বেআইনিভাবে আদায় করেছেন তা ফেরত দেবেন বলেও সমবেত কৃষকদের কাছে ঘোষণা করেন। এরপর ঘেরাও প্রত্যাহার করা হয়। এই ঘটনা উপস্থিত কৃষকদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। বহু কৃষক তাদের খাজনা সংক্রান্ত নানা সমস্যার কথা জানান। নেতৃবৃন্দ কৃষকদের আন্দোলনের হাতিয়ার গণকমিটি গঠন ও সংগঠিত তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সমাবেশ থেকেই কৃষকরা ছাদেক মণ্ডলকে সম্পাদক করে ২৫ জনের কলসুর আঞ্চলিক কৃষক সংগ্রাম কমিটি গঠন করেন।

হাবরায় এস ইউ সি আই-র পথসভায় পুলিশ চড়াও, প্রতিবাদে অবরোধ

২০ জুন হাবরায় ডিজেল, পেট্রোল ও রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এস ইউ সি আই-র পথসভায় আচমকা পুলিশ বাহিনী চড়াও হয়ে মারধর করে, গ্রেপ্তার করে পার্টি কর্মীদের। পথসভার মাইক, চেয়ার, টেবিলও পুলিশ থানায় তুলে নিয়ে যায়। সভা চলাকালীন বক্তা কমরেড পতিতপাবন মণ্ডলকে পুলিশ কলার ধরে টেনে নামায়। পুলিশের আক্রমণে ৩ জন কর্মী আহত হয় এবং ৪ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। পার্টির জেলাসম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শঙ্কর ঘোষ বলেন, মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে পথসভায় এভাবে পুলিশি তাণ্ডব আগে কোনদিন দেখা যায়নি। আমরা বিক্ষোভ দেখাইনি, রাস্তা অবরোধ করিনি, তবুও সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পথসভায় পুলিশ আক্রমণ চালাল। গণআন্দোলনের কর্মীদের থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে মামলাতেও ফাঁসানো হল।

এই পুলিশি হামলার প্রতিবাদে ২১ জুন সকালে গাইঘাটায় এস ইউ সি আই কর্মীরা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। অবরোধে পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির কালা সার্কুলারের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়।

এস ইউ সি আইকে ভোট দেওয়ার অপরাধে বিয়ে বাড়িতে সি পি এম-এর হামলা

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুগবেড়িয়া থানার বরোজ গ্রামপঞ্চায়েতের উত্তর বিজয়নগর গ্রামের বঙ্কিম বিহারী পালের মেয়ে নীলিমার বিয়ের দিন ৭ জুন রাত ৯-৩০ নাগাদ বর ও বরযাত্রীরা উত্তর বিজয়নগর গ্রামে পৌঁছালে সিপিএম-এর তপন বেরা, কাঙাল বক্স, আলেম বক্স ও পুলিন বাড়ির নেতৃত্বে তাদের আটকে রাখা হয়। ঐ সিপিএম কর্মীরা বলে, লোকসভা নির্বাচনে বঙ্কিমবাবু এস ইউ সি আইকে ভোট দিয়েছে এবং বঙ্কিমবাবুর ছেলে মনোজ কুমার পাল সিপিএম দল ছেড়ে এস ইউ সি আই দলে যোগ দিয়েছে এই অপরাধে বঙ্কিমবাবুর মেয়ের বিয়ে তারা হতে দেবে না। মেয়ের বিয়েতে বঙ্কিমবাবু দলমত নির্বিশেষে গ্রামের সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সিপিএমের নেতারা বলেন, কেন সিপিএমের লোকেদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে? ভোর ৪-৩০টার সময় সিপিএম স্থানীয় গ্রামীণ মন্দিরে বর-কনেকে মালাবদল করে বিয়ে করতে বাধ্য করে। সিপিএমের হুমকিতে নিমন্ত্রিতরা কেউ মেয়ের বাড়িতে আসতে সাহস পায়নি। ফলে সমস্ত আয়োজন নষ্ট হয়।

ঐ এলাকাটি সিপিএমের সন্ত্রাস কবলিত এলাকা। লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস বা অন্য কোন বিরোধী দল সেখানে কোন প্রচার এমনকী একটি পোস্টারও লাগাতে সাহস পায়নি। একমাত্র মনোজ পাল ভয়ভীতি উপেক্ষা করে এস ইউ সি আই-এর প্রচার করেন ও গ্রামে পোস্টার লাগান। সিপিএম-এর অত্যাচারে ক্ষুব্ধ বহু মানুষ মনোজকে গোপনে সমর্থন করেন, কেউ কেউ সাহস করে পাশেও দাঁড়ান। সিপিএম মনোজ ও তার পরিবারকে আক্রমণ ও মারধরের হুমকি দিচ্ছে। আক্রমণের আশঙ্কায় থানায় ডায়েরি করা হয়। ঐ ডায়েরি তুলে নেওয়ার জন্য সিপিএম বঙ্কিমবাবু ও তার ছেলে মনোজের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে ঐ সময়ই ওসি, বিডিও, এসডিও এবং এসডিপিও-কে বিষয়টি জানানো হয়।

পুঞ্চা ব্লকে পানীয় জলের দাবি

খরাক্লিষ্ট পুঞ্চা ব্লকের সহিস পাড়ায় পানীয় জলের তীব্র সঙ্কটের প্রতিবাদে এলাকার মহিলারা মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃত্বে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। ৭ মে বিডিও দপ্তরে মহিলারা বিক্ষোভ দেখান এবং অবিলম্বে পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য বিডিও-র কাছে দাবি জানান। সাথে সাথে এলাকা থেকে মদভাটি উচ্ছেদ এবং বিদ্যুতের ব্যবস্থা করার দাবিও তাঁরা জানান।

মূল্যবৃদ্ধির বোঝা বইবে জনগণ মালিকদের কানাকড়িও ক্ষতি নেই

একের পাতার পর

সংসারে যে প্রবল ধাক্কা দিয়েছে এটা বুঝেই সি পি এম নেতৃত্ব এ ব্যাপারে তাদের স্বভাবসিদ্ধ দ্বিচারিতার পথ নিয়েছে। তাদের বক্তব্য, রান্নার গ্যাসের এতটা মূল্যবৃদ্ধির পক্ষে সি পি এম নাকি সম্মতি দেয়নি, এবং এটা পুনর্বিবেচনার জন্য তারা অনুরোধ করেছে যাতে গ্যাসের দাম কিছুটা কমানো হয়। জনদরদের একেবারে চূড়ান্ত ! মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ঘোষণার আগেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মণিশঙ্কর আয়ার বলে দেন যে, সকল শরিক দলের ও বামপন্থীদের সম্মতির ভিত্তিতেই তিনি দামবৃদ্ধি করতে যাচ্ছেন। ''*সি পি এম নেতা সীতারাম ইয়েচুরি ও সি পি আই নেতা ডি রাজা মণিশঙ্কর আয়ারের সঙ্গে দেখা করে পেট্রলিয়ামের দাম 'সামান্য বৃদ্ধি'তে কোন আপত্তি জানান নি*' (*প্রতিদিন, ১৫-৬-০৪*)। অতএব সবটাই সাজানো নাটক, তৈলাক্ত বাঁশে বাঁদরের অঙ্কের মতো তিনহাত উঠে একহাত নামার লোকঠকানো খেলা। যে নাটকটা এ রাজ্যে প্রতিবার বাসের ভাড়া বাড়ানোর সময় তারা করে থাকে।

সি পি এম-কংগ্রেস ও বাজার অর্থনীতির ফেরিওয়ালাদের বক্তব্য হচ্ছে, বিশ্ববাজারে দাম বাড়লে ভারতে তেলের দাম না বাড়িয়ে উপায় নেই। বরাবর একথা আউড়েই সব সরকার ভারতে তেলের দাম গগনচুম্বী করে তুলেছে। নিছক টাকার অঙ্কেও ভারতে তেলের দাম আমেরিকার চেয়ে বেশি। এটা অনিবার্য ছিল না।

দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদার ৭০ শতাংশ তেল আমদানি করে ভারত সরকার। এই তেলের উপর চড়া হারে সরকারি শুল্ক বসানো আছে। ফলে, বিশ্ববাজারের দামের সঙ্গে আমদানি শুল্ক যুক্ত হয়ে ভারতে তেলের দাম বিপুলভাবে বেড়ে যায়। এর পুরো ফায়দাটি লোটে সরকারি মালিকানাধীন ইন্ডিয়ান অয়েল, ভারত পেট্রোলিয়াম ও বেসরকারি রিলায়েন্সের মতো সংস্থাগুলি। এরা দেশের আভ্যন্তরীণ তেলও (যার উপর আমদানি শুল্ক নেই) আমদানি করা তেলের দামে বিক্রি করার সুযোগ পায় এবং বেশি দরে বেচে অতি মুনাফা লোটে। দেশের বাজারে যতদিন তেলের দাম বাড়েনি, সেই সময়ে বিশ্ববাজারে তেলের দাম বাড়া সত্ত্বেও ইন্ডিয়ান অয়েল কোম্পানি (২০০৪ সালের প্রথম তিন মাসে) ১৮৪৯ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা লাভ করেছে। মালিকের মুনাফার স্বার্থে নানা আমদানি পণ্যের উপর প্রতিটি বাজেটে ক্রমাগত আমদানি শুল্ক কমানো হলেও, তেলের ওপর আমদানি শুল্ক চড়া হারেই বসানো আছে। তা কমানো হচ্ছে না। মুক্তবাজার, সংস্কার বা উদারীকরণের নীতির বিপরীত হলেও দেশিয় তেল কোম্পানিগুলির দাবি অনুযায়ী বাড়তি মুনাফার স্বার্থে তেলের ওপর চড়া আমদানি শুল্ক বহাল আছে। সম্প্রতি প্রকাশ, সরকারি দুটি তেল কোম্পানি, ওএনজিসি ও ইন্ডিয়ান অয়েল যথাক্রমে সাড়ে দশ হাজার ও ছয় হাজার কোটি টাকা লাভ করেছে গত বছর। তাছাড়াও, পেট্রোপণ্যের উপর বসানো আছে ভালোরকম উৎপাদন শুল্ক। অশোধিত তেলের উপর গড়ে ১০ শতাংশ ও পেট্রোপণ্যের উপর গড়ে ২০ শতাংশ এই শুল্ক কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের একটা বড় উৎস। পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম সরকারও পেট্রল-ডিজেলে লিটার প্রতি ১ টাকা 'সেস' চাপিয়ে রেখেছে। ফলে বিশ্ববাজারে দাম বৃদ্ধি শুধু নয়, এর সঙ্গে উৎপাদন শুল্ক ও আমদানি শুল্ক, সেস ইত্যাদি মিলে পেট্রল ডিজেল ও পেট্রোপণ্যের আকাশচুম্বী মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে।

এই বাস্তব অবস্থাই প্রমাণ করে দেয় যে, সরকার জনস্বার্থ দেখতে চাইলে পেট্রোপণ্যের আরও মূল্যবৃদ্ধি না করতে পারত। তাতে বড়জোর সরকারি-বেসরকারি তেল কোম্পানির মুনাফার অঙ্ক সামান্য কমত, লোকসানের প্রশ্নই ছিলনা। সি পি এম এই দাবি তুলল না কেন ? সি পি এম ''তেলের মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা কাটিয়ে স্বচ্ছতা আনা''র কথা বলছে। একথা বলা মানেই হল সি পি এম নেতৃত্ব জানে, কোথায় অস্বচ্ছতা আছে। পরিষ্কার ভাষায় সেকথা বলতে অসুবিধা কোথায়? এ বিষয়ে যদি তারা আন্তরিকই হোত, তবে সর্বপ্রথম মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এনে তারপর মূল্যবৃদ্ধির কথা বিবেচনার দাবি তুলত। এসব কিছুই তারা করেনি। এখন নানা কথা বলছে জনসাধারণকে ভুল বুঝিয়ে কংগ্রেসের প্রতি তাদের সমর্থনকে যুক্তিগ্রাহ্য করার জন্য।

এখানে সবচেয়ে বড় দিক হল জনস্বার্থ। ভারতের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ আজ গভীর আর্থিক সংকটের মধ্যে। একথা গত নির্বাচনের সময় কংগ্রেস-সি পি এমও বলেছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে যে গভীর সংকট দেখা দিয়েছে, তার এক বিন্দু দায়ও মালিক ও ধনিক শ্রেণী বহন করছে না। যাবতীয় বোঝা বহন করছে সাধারণ মানুষ। এবারও পেট্রোপণ্যের দামবৃদ্ধি করার ফলে সরকারি-বেসরকারি তেল কোম্পানিগুলোর মুনাফা আরো বাড়বে, সামান্য কম হারে সরকার অন্তঃশুল্ক নিলেও মূল্যবৃদ্ধির ফলে শুল্ক বাবদ সরকারের মোট আয় তেমন কিছু কমবে না। শুধু মার খাবে সাধারণ মানুষ। পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির পরিণামে সব নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদন ও পরিবহন খরচ যেটা বাড়বে, তার পুরো বোঝা চালান হয়ে যাবে জনসাধারণের ঘাড়ে, মালিক পুঁজিপতিদের এক কানাকড়িও দিতে হবে না।

যে দল বা যে জোটই সরকারে বসুক, জনগণকে সহজ বলি হিসাবে বেছে নেওয়ার প্রশ্নে সকলেই এক। কংগ্রেস জোট সরকারকে সমর্থনের প্রশ্নে সিপিএম বলেছিল, এর ফলে উন্নয়নের অভিমুখ দেশের দরিদ্রশ্রেণীর অভিমুখে ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। এই হচ্ছে তার নমুনা! সি পি এম সমর্থিত কেন্দ্রের সরকার যদি সত্যই জনমুখী হত, তবে তাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য ছিল মূল্যবৃদ্ধির বোঝা জনগণের ঘাড়ে চাপানোর আগে বিকল্প পথের সন্ধান করা। এটা করা দুঃসাধ্য কিছু নয়। সরকারি কোষাগারে অর্থসংগ্রহ যদি সরকারের লক্ষ্য হয়, তবে যে মালিকশ্রেণী জনগণকে নির্মম শোষণ করে বিপুল পুঁজির পাহাড় সৃষ্টি করেছে, হাজার হাজার কোটি টাকা কর ফাঁকি দিয়ে রেখেছে, কালো টাকার সমান্তরাল অর্থনীতি যারা চালাচ্ছে, সরকার তাদের ধরল না কেন? তাছাড়া মাথাভারী প্রশাসন, মন্ত্রী-আমলা-এম পিদের পেছনে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা ব্যয় সরকার কমাতে পারত। দুর্নীতির স্রোতে সরকারি তহবিলের ভেসে যাওয়া আটকাতে পারত। শিল্পোন্নয়নের নাম করে মালিক গোষ্ঠীদের যেভাবে নানা খাতে সরকারি আর্থিক সুবিধা, ছাড় ও সুযোগ দেওয়া হয়, সরকার তা কমাতে বা বন্ধ করে দিতে পারত। অথচ পূর্বতন সরকারগুলির মতই তারা সে পথে হাঁটলই না। 'আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লে এখানে তো বাড়াতেই হবে' — এই যুক্তিতে সেই বোঝাটাকেই না খেতে পাওয়া, অভাবে-কষ্টে ন্যুব্জ গরিব মানুষের ঘাড়েই তারা চাপাল। তাহলে সিপিএম সমর্থনপুষ্ট এই সরকার কী অর্থে পূর্বতন সরকার থেকে পৃথক!

বাজার অর্থনীতির প্রচারকরা বলেন, অত্যাবশ্যক পণ্য, পরিষেবা সহ সমস্ত জিনিসের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ চলবে না, বাজারদর সকলকেই দিতে হবে, বাজারদর থেকে কম দরে কিছু পাওয়ার দাবি ছাড়তে হবে, অর্থনীতির নিয়মে যদি দাম বাড়ানো অনিবার্য হয় তবে 'জনগণকে খুশি' রাখতে দর কমিয়ে রাখা উচিত নয়। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, যেসব ক্ষেত্রে দাম কম থাকলে জনগণের সুবিধা হয়, কেবল সেইসব ক্ষেত্রেই এরা বাজারদরের প্রশ্ন আনে। কিন্তু 'শিল্পায়নের' দোহাই দিয়ে মালিকদের অতি সস্তা দরে জমি, বিদ্যুৎ, জল দেওয়া, মালিকদের সুবিধার জন্য কর কমানো, সরকারি খরচে রাস্তাঘাট, সেতু তৈরি করে দেওয়ার প্রশ্নে এরা বাজারদরের কথা বলে না, সরকারি সাহায্য বা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কিংবা ভরতুকির বিরুদ্ধতা করে না।

আটের পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিবাদ

অশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধির অজুহাতে পেট্রল-ডিজেল-রান্নার গ্যাস এবং যার সঙ্গে তেলের কোন সম্পর্ক নেই সেই কয়লার সাম্প্রতিক ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী, ১৬ জুন ২০০৪ এক বিবৃতিতে বলেন, এর দ্বারা পুঁজিপতিশ্রেণীর নির্মম শোষণে জর্জরিত জনসাধারণের উপর আবার একটি আক্রমণের খড়্গ নামিয়ে আনা হল, যার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিতে সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস এবং পরিষেবার আরও মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে। এবং এবার এই আক্রমণ হানল সিপিএম ও তার সহযোগীদের দ্বারা সমর্থিত কংগ্রেস সরকার।

এই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য দেশের জনগণকে প্রতিবাদে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে কমরেড মুখার্জী বলেন, পুঁজিবাদী শাসকদের কোনও নৈতিক অধিকার নেই তাদেরই সৃষ্ট সঙ্কটের বোঝা জনসাধারণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার।

কমরেড মুখার্জী আরও বলেন, আন্তর্জাতিক অয়েল কার্টেলগুলি যেভাবে একচেটিয়া কর্তৃত্বে যথেচ্ছ দামবৃদ্ধি করছে, তার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী জনমত গড়ে তোলাই যখন আজ সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন, তখন বুর্জোয়া শাসক দলগুলি তো বটেই, এমনকী বামপন্থী বচনবাগীশ সিপিএম-সিপিআইও মূল্যবৃদ্ধির চাপ থেকে পুঁজিপতিদের রেহাই দিতে মূল্যবৃদ্ধির পুরো বোঝাটা সাধারণ মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে দ্বিধা করছে না।

পেট্রল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস ও কয়লার মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে

রাজ্যে রাজ্যে বিক্ষোভ

ওড়িশা

১৬ জুন ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বর, অনগুল, রাউরকেলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন শহর-গঞ্জে এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভা করা হয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

ভুবনেশ্বরের রাসমহল স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন দলের ওড়িশা রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেডস্ বীণাপাণি দাস, রঘুনাথ দাস, ছবি মহান্তি। ডি ওয়াই ও ও ডি এস ও'র নেতা পূর্ণচন্দ্র বেহেরা ও রাজেন্দ্র বর্মাও এই সভায় বক্তব্য রাখেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই মূল্যবৃদ্ধির তীব্র সমালোচনা করে বক্তারা বলেন, এর ফলে গরিব সাধারণ মানুষের উপরে আর্থিক বোঝা আরও বাড়বে।

ত্রিপুরা

১৬ জুন বিকাল ৫টায় সর্বভারতীয় ধিক্কার দিবসের অঙ্গ হিসাবে আগরতলা শহরের বটতলায় এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ বাবুল বণিক, শিবানী দাস ও সুব্রত চক্রবর্তী। বক্তারা বলেন, কংগ্রেস নির্বাচনের আগে বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির পরিবর্তনের কথা বলে নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়েছে। আর এখন সরকারে বসেই জনগণের উপর মূল্যবৃদ্ধির বোঝা চাপাচ্ছে। সি পি এম পরিচালিত বামফ্রন্ট সেই কংগ্রেস সরকারকে পুরোপুরি সমর্থন করছে। সরকারের এই জনবিরোধী পদক্ষেপ বাতিল করার একমাত্র পথ গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য আহ্বান জানান বক্তারা।

পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে জামশেদপুরে বিক্ষোভ

পাটনায় প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ

আসামের ইল্‌লিগ্যাল মাইগ্র্যান্টস অ্যাক্ট প্রসঙ্গে

আই এম ডি টি আইনের পটভূমি

ছয় বছরের আসাম আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির পটভূমিতে, আসাম রাজ্যের নিপীড়িত ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণ এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির দাবিতে, প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের জোর করে বিদেশি বানিয়ে দেশ থেকে তাড়ানোর চেষ্টা ও প্রশাসনিক হয়রানি থেকে রক্ষা করা এবং প্রকৃত বিদেশিদের চিহ্নিত করার লক্ষ্য থেকে ১৯৮৩ সালে রচিত হয়েছিল ইল্‌লিগ্যাল মাইগ্র্যান্টস্ (ডিটার্মিনেশন বাই ট্রাইব্যুনাল) অ্যাক্ট।

'৭৯ থেকে '৮৫, ছয় বছরের সর্বনাশা আসাম আন্দোলনের নায়ক 'আসু' (অল আসাম স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন) অন্যান্য উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী শক্তিকে একজোট করে এই আই এম ডি টি আইন বাতিলের দাবি তুলে আসামে আবার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পরিবেশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। কেন্দ্রের পূর্বতন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে এক্ষেত্রে তাদের সহায়কের ভূমিকা নিয়েছিল এবং এই আইন বাতিলের উদ্যোগ নিয়ে একটি বিল সংসদের সিলেক্ট কমিটিতে পাঠিয়েছিল। কেন্দ্রে নবগঠিত কংগ্রেস জোট সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখার্জী এই সিলেক্ট কমিটির চেয়ারম্যান। অথচ নয়া কেন্দ্রীয় সরকার এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন অভিমত এখনও প্রকাশ করেনি। ফলে এই আইন বাতিলের দাবিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আশঙ্কার অবসানের বাস্তব কোন কারণ ঘটেনি।

আসাম থেকে 'বহিরাগত' ও 'বিদেশি'দের বিতাড়নের যে দাবি 'আসু' ১৯৭৯ সাল থেকে এবং '৮৫ সালে গঠিত তার রাজনৈতিক সংগঠন অসম গণপরিষদ (এজিপি) তুলেছিল; সেই দাবিকেই দীর্ঘদিন কেন্দ্রে ও আসাম রাজ্যে অপশাসন চালানর নায়ক এবং জনগণ কর্তৃক ধিক্কৃত কংগ্রেস মদত দেয়।

স্বাধীনতার পর ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ৩১ বছর কংগ্রেস আসাম রাজ্যে চূড়ান্ত অপশাসন চালিয়েছে। পুঁজিবাদের আওতায় অন্যান্য রাজ্যে সীমিত হলেও যতটুকু অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে, আসামে তেমন উন্নয়ন ঘটানোও হয়নি। বরং চূড়ান্ত অপশাসন ও আর্থিক দুর্দশার কারণে জনগণের মধ্যে গড়ে ওঠা শাসকদলের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ঘৃণা, ক্ষোভ যাতে সংগঠিত আন্দোলন রূপে ফেটে পড়তে না পারে, সেজন্য শাসক ও বুর্জোয়া দলগুলি জনগণকে অসমীয়া, বাঙালি, উপজাতীয়, অনুপজাতীয়, বিদেশি প্রভৃতি নানা ভাগে বিভক্ত করার জঘন্য পথ গ্রহণ করে। শোষিত জনগণের মধ্যে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদ ও বিদ্বেষের পরিবেশের সুযোগ নিয়ে, সংখ্যালঘু বিদ্বেষের উপর ভর করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নিজেদের সংগঠন বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য আর এস এস ও জনসংঘ অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। অন্যদিকে শাসক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনগণের বিক্ষোভের পটভূমিতে এই সময়েই আসামের অত্যন্ত দুর্বল বামপন্থী দলগুলির শক্তিবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। বামপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধিতে ভীত বুর্জোয়াশ্রেণী ও বুর্জোয়া দলগুলি জনগণের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভকে উগ্র-সঙ্কীর্ণতাবাদের কানাগলিতে ঢুকিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়। বরাক উপত্যকা বাদে আসামের অন্যান্য অংশের নানা ছাত্র ইউনিয়নগুলিকে জড়িত করে 'আসু' গড়ে ওঠে। 'আসু' মুখে নিজেদের অরাজনৈতিক সংগঠন বললেও আসলে তা মোটেই রাজনীতির ঊর্ধ্বে ছিল না। ক্ষমতায় থাকার সুবাদে টাকা-পয়সা চাকরি-বাকরি সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি দিয়ে কংগ্রেসই তাকে নিয়ন্ত্রণ করত। আমাদের দল স্পষ্টভাষায় এই চক্রান্তের নেপথ্যে ক্রিয়াশীল কংগ্রেসের হীন ও ভয়ঙ্কর রাজনীতির প্রকৃত চরিত্র উদ্‌ঘাটন করে দেখিয়েছে। '৭৮ সালে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ''১৯৭৯ সালে অতি শীঘ্র পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসার তাগিদে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে মূলত কংগ্রেসীরাই এই অমানবিক, অমানুষিক বিদেশি বিতাড়ন আন্দোলন শুরু করেছিল। খুবই ধূর্ত ছিল তাদের প্রচেষ্টা। ওরা নিজেদের পর্দার আড়ালে রেখে নিশ্চিতরূপে ওদের প্রভাবাধীন সারা *অসম ছাত্র সঙ্ঘ* বা আসু (AASU)কে সামনে রেখে, ভাল করে বললে শিখণ্ডী খাড়া করে শুরু করে এই কাজ।'' (আই এম ডি টি আইন বাতিলের অন্যায় ও অযৌক্তিক দাবি প্রতিহত করুন, এস ইউ সি আই, আসাম রাজ্য কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা)।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, প্রকৃত বিদেশিদের চিহ্নিত করতে হবে এবং তাদের ফেরত পাঠাতে হবে — এ প্রশ্নে সব রাজনৈতিক দলই একমত। কিন্তু কে বিদেশি? কোন্ মাপকাঠিতে তার বিচার হবে? তা নিয়ে তীব্র মতপার্থক্য রয়েছে। আসামে বসবাসকারী ভাষিক ও ধর্মীয়, দু'ধরনের মানুষকে ঘিরেই 'বিদেশি' প্রশ্নটা জোরালোভাবে দানা বেঁধে ছিল।

উল্লেখিত দু'টি জনগোষ্ঠীর মধ্যে একদল হল মূলত অনসমীয়া হিন্দু বাস্তুহারা। আসামে এঁরা ভাষিক সংখ্যালঘু। পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তানে ঘন ঘন দাঙ্গার কারণে বহু বছর আগেই এঁরা এদেশে এসেছেন। মনে রাখা দরকার, দেশবিভাগের সময়ে ভিটেমাটি হারিয়ে যে উদ্বাস্তুরা এসেছিলেন তাঁদের রক্ষা করতে এবং নাগরিকত্ব দিতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। কিন্তু আসাম আন্দোলনের প্রবক্তারা তা মানতে রাজি হননি শুধু নয়, তাদের ধরে ধরে বাংলাদেশে পাঠানোর মতো বিদ্বেষমূলক দাবিও তাঁরা তুলেছেন।

দ্বিতীয় জনগোষ্ঠীটি হল, মূলত অভিবাসী মুসলমান, যাঁরা আসাম সরকারের অনুমতির ভিত্তিতে অবিভক্ত ভারতবর্ষের পূর্ববঙ্গের (পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান, অধুনা বাংলাদেশ) আসাম সংলগ্ন জেলাগুলি থেকে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে আসামে এসেছিলেন। এঁরা সকলেই প্রকৃত ভারতীয়। ভারতভাগের পর এদের পূর্বতন বাসভূমি পূর্বপাকিস্তানে পড়লেও এবং ১৯৭১ সালে তা স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত হলেও অভিবাসীদের সঙ্গে পূর্বপাকিস্তান বা বাংলাদেশের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আসাম আন্দোলনের প্রবক্তারা বললেন — এঁরা 'অনুপ্রবেশকারী'। একথার দ্বারা আসলে তাঁরা এঁদের ভারতীয়ত্ব অস্বীকার করে বিতাড়নের পক্ষেই মানসিকতা তৈরি করতে চাইছিলেন।

আসামে 'বিপুল বিদেশি'র মিথ্যা জিগির

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ থেকে চালিত হয়ে, আসাম আন্দোলনের প্রবক্তারা বললেন — আসামে নাকি চল্লিশ লক্ষেরও বেশি বিদেশি আছে। কেউ কেউ বললেন, সংখ্যাটা আরও বেশি। বলাবাহুল্য এই বক্তব্য পুরোটাই ভিত্তিহীন শুধু নয়, এর পিছনে একটা সুনির্দিষ্ট মতলব আছে।

লক্ষ করলেই দেখা যাবে, তাঁদের দেওয়া এই সংখ্যাটা বাস্তুহারা হিন্দু ও অভিবাসী মুসলমান, দু'দল মানুষের সমষ্টির সমান। অর্থাৎ, এই সংখ্যাটা দিয়ে তাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন যে, বাস্তুহারা হিন্দু ও অভিবাসী মুসলমান — উভয় জনগোষ্ঠীর সকলেই 'বিদেশি'। এ থেকে স্পষ্টই বেরিয়ে আসে, প্রকৃত বিদেশি কারা তা চিহ্নিত করা নয়, ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের বিদেশি মার্কা দিয়ে বিতাড়িত করাই তাঁদের লক্ষ্য। এর পরই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক অধ্যুষিত গ্রামগুলির ওপর মারণ হামলা চালিয়ে, ঘরবাড়িতে আগুন দিয়ে, হাজার হাজার মানুষকে নৃশংসভাবে খুন করে তাঁরা বুঝিয়ে দেন তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী?

ক্ষমতার স্বার্থে আসামের মানুষকে উগ্র বিদ্বেষে মাতিয়ে নিজেদের পক্ষে আনার জন্য তাঁরা যুক্তি দেন — আসাম থেকে যদি বিদেশিদের (আসলে যারা প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক) তাড়ানো যায় তবে অসমীয়াদের চাকরির সুযোগ বাড়বে, এদের দখল করা জমি অসমীয়ারা পাবে। অর্থাৎ, পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ না করেও বিদেশি বিতাড়ন করলেই আসামের জনগণের জীবনের প্রধান সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব, এমন ধরনের মিথ্যা প্রচারের দ্বারা জনগণকে বিভ্রান্ত ও উত্তেজিত করে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে জনরোষকে তাঁরা ভুল পথে চালিয়ে দেন, জনগণের ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে ওঠার সম্ভাবনার মূলে কুঠারাঘাত করেন এবং গোটা আসামে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের রক্তস্রোত বইয়ে দেন। রাজ্যের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি একে মেনে নেয়নি, তারা আসাম আন্দোলনের প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। একদিকে নিশ্চিতরূপে ভারতীয় নাগরিক এমন লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার মরিয়া প্রচেষ্টা, আর অন্যদিকে তাকে প্রতিহত করার জন্য সংখ্যালঘু জনগণ ও গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের মরণপণ সংগ্রাম, সংখ্যালঘুদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের পক্ষে বামপন্থীদের আন্দোলন — এমনই এক অগ্নিগর্ভ অবস্থায় প্রতিরোধের মুখে 'আসু'কে কিছুটা পিছু হঠতে হয়। এই পরিবেশেই প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা ও হয়রানি বন্ধ করতে রচিত হয় আই এম ডি টি আইন। ১৯৭১ সালকে বিদেশি অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিতকরণের বর্ষসীমা (cut-off year) নির্ধারণ করাই এই আইনের মূল ভিত্তি। এর সাথে 'আসু'র আন্দোলনের একটা পর্যায় শেষ হয়। এই আইনে নাগরিকদের সম্পর্কে বিস্তারিত তদন্ত করার এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের স্ক্রিনিং কমিটির মাধ্যমে ট্রাইব্যুনালে পাঠানোর প্রভূত ক্ষমতা পুলিশকে দেওয়া হয়।

এরপর '৮৫ সালে রাজীব গান্ধী 'আসুর' সঙ্গে 'আসাম চুক্তি' সই করেন। ওই বছরই 'আসু' এজিপি গঠন করে এবং '৮৫-র নির্বাচনে এজিপি ক্ষমতায় আসে। 'আসু'র সঙ্গে সম্পাদিত আসাম চুক্তি অনুসারে আই এম ডি টি'র ১৯৭১ সালের বর্ষসীমা সংশোধিত হয় এবং স্থির হয় ১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে '৭১-এর ২৪ মার্চ পর্যন্ত সময়ে যাঁরা ভারতে এসেছেন তাঁদের ফরেনার্স অ্যাক্ট ১৯৪৬-এর ৬ ধারা অনুযায়ী 'বিদেশি' হিসাবে চিহ্নিত করা হবে, কিন্তু বহিষ্কার করা হবে না। ১০ বছরের জন্য তাঁদের নাগরিকত্বহীন থাকতে হবে। অর্থাৎ, 'আসু'র বিদেশি বিতাড়নের কর্মসূচি একটা নতুন কৌশলী পথ ধরে।

এর ফলে বাস্তবে আসামে বিদেশি চিহ্নিতকরণের প্রশ্নে দু'ধরনের ট্রাইব্যুনাল চালু হয়ে যায়।

১৯৭১-এর পরে যাঁরা এসেছেন তাঁদের চিহ্নিত করার জন্য আই এম ডি টি আইনে ১৬টি ট্রাইব্যুনাল চালু হয় এবং '৬৬ থেকে '৭১ পর্যন্ত সময়সীমায় আগতদের চিহ্নিত করার জন্য ব্রিটিশ আমলের ফরেনার্স অ্যাক্ট -১৯৪৬ অনুযায়ী পৃথক ১৫টি ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। এজন্য সংসদে ১৯৫৫ সালের ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ আইন সংশোধন করা এবং তার সাথে নতুন ৬ক উপধারা যুক্ত করা হয়।

বিপুল সংখ্যক 'বিদেশি' খুঁজে পায়নি এজিপি সরকার

সকলেই জানেন, আসাম চুক্তির গোপন শর্ত অনুযায়ী হিতেশ্বর শইকিয়ার নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার পদত্যাগ করে এবং কেন্দ্রের রাজীব গান্ধীর কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে আসামে এজিপি ক্ষমতায় আসে। সাথে সাথে তারা 'বিদেশি চিহ্নিতকরণের' কাজে পূর্ণোদ্যমে নেমে পড়ে। গোটা রাজ্যে গ্রামে শহরে তন্ন তন্ন করে বিদেশি খোঁজার জন্য এজিপি সরকার পুলিশকে নির্দেশ দেয়। এভাবে তল্লাসি চালিয়ে পুলিশ-প্রশাসন দু'লক্ষ অষ্টআশি হাজার ব্যক্তিকে সন্দেহভাজন বলে চিহ্নিত করে স্ক্রিনিং কমিটির কাছে পাঠায়। স্ক্রিনিং কমিটি বাছাই করে এ থেকে মাত্র পঁচিশ হাজার কেস ট্রাইব্যুনালে পাঠানোর যোগ্য মনে করে। ট্রাইব্যুনাল এ থেকে মাত্র ৮৬৯৪ জনগণকে বাংলাদেশি নাগরিক বলে চিহ্নিত করে। তন্ন তন্ন করে খোঁজার পর এত সামান্য সংখ্যক বিদেশি খুঁজে পাওয়ার ঘটনা প্রমাণ করে — 'লক্ষ লক্ষ বিদেশি অনুপ্রবেশের' যে দাবি আসাম আন্দোলনের প্রবক্তারা করেছেন, তা ভিত্তিহীন।

এবার আই এম ডি টি আইনটাই বাতিলের দাবি

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের 'বিদেশি' বলে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হওয়ার পর তাঁরা নতুনভাবে ভিন্ন কায়দায় আক্রমণ শুরু করেন। প্রকৃত ভারতীয়দের বিদেশি বানাবার জন্য ধুয়ো তোলেন — আই এম ডি টি আইনটাই বিদেশি খুঁজে বার করার পথে বাধা। কাজেই ওই আইনটাকেই বাতিল করা দরকার। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৯৮৬ সালে এঁদেরই প্রস্তাব অনুযায়ী আই এম ডি টি আইনে কয়েকটি সংশোধনী গৃহীত হয়েছিল, তখন তাঁরা এই আইন বাতিলের দাবি করেননি। কিন্তু এখন 'বিপুল সংখ্যক' বিদেশি খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়ে নিজেদের আনা সংশোধনী সমেত পুরো আইনটাই বাতিলের দাবি তাঁরা তোলেন।

আই এম ডি টি আইন বাতিলের পেছনে প্রকৃত চক্রান্ত

কেন তাঁরা আইনটি বাতিলের দাবি তুলছেন? কী তাঁদের যুক্তি? তাঁরা বলছেন — প্রথমত, যেহেতু এই আইন কেবল আসামের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তাই এটা বৈষম্যমূলক। দ্বিতীয়ত, তাঁরা বলছেন, এই আইন অনুযায়ী

ছয়ের পাতায় দেখুন

হাইতি জুড়ে সন্ত্রাস চলছে

২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন মদতপ্রাপ্ত হাইতির শিল্প মালিক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের জোট 'গ্রুপ ১৮৪'কে সামনে রেখে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট আরিস্তিদেকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। তারাই 'গ্রুপ ১৮৪'র বকলমে এখন দেশ চালাচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায় টহল দিচ্ছে ভেঙে দেওয়া হাইতি সেনাবাহিনীর পরিবর্তে মার্কিন, ফরাসি, চিলি এবং কানাডীয় বাহিনীর ৩৬০০ জন বিদেশি সেনা। প্রধানত এদেরই মদতে এখন হাইতি জুড়ে চলছে সন্ত্রাস। গত ১মে মে দিবস উপলক্ষ্যে হাইতির বৃহত্তম শ্রমিক সংগঠন কনফেডারেশন অফ হাইতিয়ান ওয়ার্কার্স (CTH)'র উদ্যোগে রাজধানী শহর পোর্ট অফ প্রিন্সে এক শ্রমিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। আমেরিকা ও কানাডা থেকে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিরাও এই কনভেনশনে যোগ দেন। এঁদের উপস্থিতিতেই হাইতির খেটেখাওয়া মানুষের বিভিন্ন অংশ থেকে আসা শ্রমিক প্রতিনিধিরা দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতার বিবরণ তুলে ধরেন।

জেল, খুন, প্রতিহিংসা, সন্ত্রাস এবং ভয়ভীতি অব্যাহত

ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট আরিস্তিদের রাজনৈতিক সংগঠন লাভালাস-এর পাশে এসে দাঁড়ানোর জের হিসাবে অভ্যুত্থানকারীরা বহু ছাত্রছাত্রীর পড়াশুনায় ইতি টেনে দিয়েছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে তাদের বিতাড়িত করেছে। এ ধরনের অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছে কনভেনশনে আসা জনৈক ছাত্রী ডেলিগেট। সে আরও জানিয়েছে, ''অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর নির্মম অত্যাচার নামিয়ে আনা হয়েছে এবং বহু ছাত্রীকে ধর্ষণও করা হয়েছে। স্বভাবতই ভীত-সন্ত্রস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা এখন গোপন স্থানে গা ঢাকা দিয়ে আছে।''

অভ্যুত্থানের দিন সন্ধ্যায় সন্ত্রাসবাহিনী পরিবহন শ্রমিকদের সমবায় সমিতি পরিচালিত একটি বাসে আগুন ধরিয়ে সেটাতে ভাঙচুর চালায়। শ্রমিক ইউনিয়নের নৈশ প্রহরীকে মারধর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং ইউনিয়ন অফিসে ভাঙচুর চালানো হয়। কনভেনশনে আসা মার্কিন ও কানাডীয় শ্রমিক প্রতিনিধিদের সে সব ভাঙচুরের দৃশ্য ঘুরিয়ে দেখানো হয়েছে। এ ধরনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে মার্কিন ও কানাডীয় শ্রমিক শ্রেণীর সক্রিয় সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

উত্তর হাইতির বিশিষ্ট কৃষক নেতা ময়জেস ডেলিগেটদের জানিয়েছেন, অভ্যুত্থানের পরবর্তী কালে দেশে খুন-জখম, অপহরণ, অত্যাচার অবাধে চলছে। তিনি জানান, ভীত ও সন্ত্রস্ত লাভালাস কর্মী ও সমর্থকরা পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে গিয়েছিল। তিনিও পালিয়ে গিয়েছিলেন।

অভ্যুত্থানের পর উত্তর হাইতির নয়া শাসকরা বহু মানুষকে ধরে এনে হত্যা করেছে। শত শত মৃতদেহ সমুদ্র সৈকতে ফেলে রাখা হয়েছিল, ঢেউ এসে সেগুলি ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বহু মানুষকে ধরে এনে খাবার ও পানীয় জল না দিয়ে জাহাজের খোলে বন্দী করে রাখা হয়। বিদেশি ডেলিগেটদের লক্ষ্য করে ময়জেসের প্রশ্ন ছিল — ''হেলিকপ্টার ও বিমান ব্যবহার করার মত বিপুল অর্থ তথাকথিত বিদ্রোহীরা কোথা থেকে পেল?'' পরক্ষণে তিনিই উত্তর দিয়েছেন, ''হাইতির অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষরাই এদের প্রচুর অর্থ যুগিয়েছে।''

সরকার বদলের সুযোগ নিচ্ছে মিল মালিকরা

CTH-এর সেক্রেটারি জেনারেল প্যান চেরি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, সরকার বদলের সুযোগকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে হাইতির মিল মালিকরা তাদের সংস্থায় শ্রমিকদের ইউনিয়ন করার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি অভ্যুত্থানের একজন নেতা ও জনৈক 'সোয়েট শপ' মালিক (sweat shop হচ্ছে, যেখানে নামমাত্র মজুরিতে শ্রমিকদের উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে বাধ্য করানো হয় এবং বার্ষিক ছুটিছাটাও দেওয়া হয় না) অ্যান্ডি অ্যাপেড-এর কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, এ লোকটি তাঁর সংস্থায় শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠনের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। পূর্ববর্তী সরকারের আমলে নির্ধারিত দৈনিক ন্যূনতম মজুরির হার কমিয়ে এনে এখন ১.৯০ ডলার ধার্য করা হয়েছে। যেসব শ্রমিক চেষ্টা করছে ইউনিয়ন গঠন করার তাদের মারধর করা হচ্ছে এবং ছাঁটাই করা হচ্ছে। পূর্ববর্তী সরকারের আমলে সোয়েট শপ শ্রমিকদের বিনা পয়সায় জল ও খাবার দেওয়া হতো। এখন সেটাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

CTH নেতা আরও জানান, সরকার বদলের পর সব চাইতে অসহনীয় অবস্থার মধ্যে পড়েছে ঠিকা শ্রমিকরা। যেখানে ৫০০ শ্রমিক কাজ করে সেখানে মাত্র ৩৫ জনকে স্থায়ী করে বাকিদের অস্থায়ী রাখা হয়েছে।

আরিস্তিদে সরকারের আমলে শ্রমিকদের জন্য একটি স্বাস্থ্যবীমা চালু করা হয়েছিল, তাতে খরচের ৫০ শতাংশ যোগাতো সরকার। এখন সেটাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখিত অ্যান্ডি অ্যাপেড একটি রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিফোন কোম্পানি Telewকে কিনে নিয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে যাতে সমগ্র টেলিফোন ব্যবসাটাই বেসরকারি মালিকানায় ঠেলে দেওয়া যায়।

মর্কিন-ফরাসি সেনা প্রত্যাহার ও প্রেসিডেন্ট আরিস্তিদের প্রত্যাবর্তনের দাবিতে ৫ জুন ওয়াশিংটনে বিক্ষোভ

খেটে খাওয়া মানুষ আরও দুর্দশায়

অভ্যুত্থানের পর হাইতিতে চালের দাম বেড়েছে তিনগুণ। স্বভাবতই হাইতির মানুষের জীবনে নেমে এসেছে অনাহার, তার সঙ্গে প্রচণ্ড হতাশা। ক্ষোভে দুঃখে একজন শ্রমিক বলেই ফেলেছেন, ''অভ্যুত্থান ও (মার্কিন) দখলদারি হাইতির শ্রমিক, কৃষক এবং গরিবদের জন্য স্থায়িত্ব অথবা উন্নত জীবন যাত্রার সুবার্তা বয়ে আনেনি।' (ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড (নিউইয়র্ক) ১৩ ও ২০ মে ২০০৪)

এ আই ডি এস ও'র শিক্ষাশিবির

এ আই ডি এস ও'র ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে আরও শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলনের প্রস্তুতির লক্ষ্যে সারা দেশের কর্মী সংগঠকদের নিয়ে পূর্বাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চল এই চারটি রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির সংগঠিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এ আই ডি এস ও'র সর্বভারতীয় কমিটি। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথমে পূর্বাঞ্চলীয় শিক্ষাশিবিরটি অনুষ্ঠিত হল ১০ থেকে ১২ জুন জলপাইগুড়ি শহরে। এই শিক্ষাশিবিরে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, আসাম, ত্রিপুরা ও সিকিমের ছাত্র প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

১০ জুন জলপাইগুড়ি শহরের সরোজেন্দ্র দেব রায়কত সাংস্কৃতিক কলাকেন্দ্রে শিক্ষাশিবির শুরু হয়। শহীদ বেদীতে মাল্যার্পণ করেন এস ইউ সি আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং এ আই ডি এস ও'র প্রতিষ্ঠা পর্বের অন্যতম সংগঠক কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। তিনি শিক্ষাশিবিরেরও উদ্বোধন করেন। এছাড়া শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন এ আই ডি এস ও'র সর্বভারতীয় কমিটির পক্ষে সহসভাপতি কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান, ওড়িশা রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড রাজেন্দ্র ভার্মা, আসাম রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড তুষার পুরকায়স্থ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড সুব্রত গৌড়ী, ত্রিপুরা স্টেট অর্গানাইজিং কমিটির সদস্য কমরেড মৃদুল সরকার এবং সিকিম ছাত্র প্রতিনিধিদের পক্ষে কমরেড হেমন্ত দেওয়ারী।

পাঁচটি রাজ্যের ছাত্রকর্মীরা মার্কসবাদের তত্ত্বগত নানা বিষয় সহ সংগঠন গড়ে ওঠার ইতিহাস, বর্তমানে ছাত্র আন্দোলন ও সামাজিক আন্দোলনে ব্যক্তির ভূমিকা এবং সাংগঠনিক নানা বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে বহু প্রশ্ন রাখেন। উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য দু'টি অধিবেশনে সমাজবিকাশের ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা, ভারতবর্ষে একটি সত্যিকারের সাম্যবাদী দল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের সংগ্রাম, স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন সামান্য ভলান্টিয়ার থেকে সর্বহারাশ্রেণীর শিক্ষক ও মহান নেতা হিসাবে তাঁর উত্থানের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

জীবনের গোড়ার দিকের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা যখন সংগঠনে আসি, আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী হবে তা নিয়ে আমাদের মধ্যে অনিশ্চয়তা, দোদুল্যমানতা ছিল। কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের সঙ্গে থেকে সাহচর্য দিয়ে আমাদের মনের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর অঙ্কের মতো মিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সংস্পর্শে আসার পর জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের আর কোন দ্বিধা ছিল না। বিপ্লবী জীবন ছাড়া অন্য কিছু ভাবার অবকাশই ছিল না। আজকের দিনের সংগঠক-কর্মীদের এই শিক্ষাটি গ্রহণ করার জন্য কমরেড ভট্টাচার্য আবেদন জানান। তিনি বলেন, একজন ব্যক্তির মনে যে সমস্যাগুলি ধাক্কা দিচ্ছে, বিপ্লবীরা যদি সেই প্রশ্নের মীমাংসা কোথায় তা স্পষ্ট করে দিতে না পারে তবে বিপ্লবের পথে মানুষ আসবেন কীভাবে? এবং এর জন্যই গভীর জ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয়তা। দ্বিতীয় অধিবেশনে মার্কসবাদের নানা তত্ত্বগত প্রশ্নের উপর আলোচনা হয়।

শিক্ষাশিবিরের শেষ তিনটি অধিবেশন পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং এ আই ডি এস ও'র

আটের পাতায় দেখুন

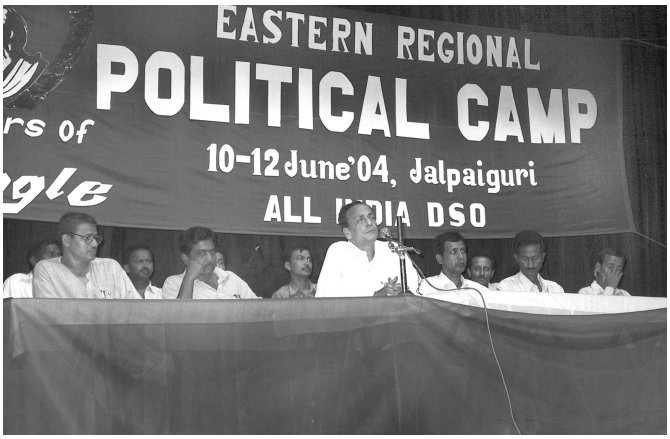

এ আই ডি এস ও'র শিক্ষাশিবিরে বক্তব্য রাখছেন কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

আই এম ডি টি আইন প্রসঙ্গে

চারের পাতার পর

সন্দেহভাজন ব্যক্তি বিদেশি কি বিদেশি নয়, তা প্রমাণের দায় অভিযোগকারীর উপরেই বর্তায়। তাঁদের মতে এই দায় অভিযুক্তের উপরেই দেওয়া উচিত। অর্থাৎ, তাঁরা চান অভিযোগকারী সরকার কাউকে 'বিদেশি' বলে ছাপ দিলে সরকারকে তার সত্যতা প্রমাণ করতে হবে না। সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকেই প্রমাণ করতে হবে, সে বিদেশি নয়। এই যুক্তিতে আই এম ডি টি বাতিলের দাবি তোলার কোনই যৌক্তিকতা নেই।

কারণ, প্রথমত এই আইন যে কেবল আসামের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন বুঝলে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে দেশের যে কোন রাজ্যেই যে এই আইন প্রয়োগ করতে পারে — তা এই আইনে স্পষ্টই বলা আছে। তাছাড়া বিশেষ রাজ্যের বিশেষ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে কেবল সেই রাজ্যে প্রয়োগযোগ্য কোন আইন নিশ্চয় রচিত হতে পারে এবং তেমন হলেই তা বৈষম্যমূলক — একথা বলা চলে না। দ্বিতীয়ত, এই আইনে বিদেশি প্রশ্নে প্রমাণের দায় অভিযোগকারীর — এই যুক্তিও সর্বৈব মিথ্যা, কারণ আই এম ডি টি আইনে বলা আছে, অভিযুক্তকে প্রমাণ দাখিল করে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এক্ষেত্রে একটা নীতিগত বড় প্রশ্ন আছে। অভিযোগ প্রমাণের দায়িত্ব অভিযোগকারীর — এ হল গণতান্ত্রিক বিচারনীতির একটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্তম্ভ। এ না হলে রাষ্ট্র, পুলিশ-প্রশাসন, ধনী ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা কেবল জামিন অযোগ্য ধারায় অভিযোগ এনেই যেকোন ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করে জেলে পচাতে পারবে। ফলে বাস্তবে গণতন্ত্র ধ্বংস হয়ে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। তৎসত্ত্বেও আই এম ডি টি আইনে অভিযুক্তের উপরেও প্রমাণের দায় অনেকখানি চাপানো হয়েছে। কিন্তু এতেও বিজেপি বা 'আসু' খুশি নয়। গণতান্ত্রিক বিচারপদ্ধতিকে পদদলিত করে তারা চাইছে 'বিদেশি' হিসাবে চিহ্নিত ব্যক্তি যেন আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগই না পায়।

বর্ষসীমা বদলের গভীর ষড়যন্ত্র

শুধু তাই নয়, আই এম ডি টি আইন বাতিলের দাবির নেপথ্যে আরও একটি গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। সেটি হল — এই আইনে বিদেশি চিহ্নিতকরণের বর্ষসীমা নির্ধারিত হয়েছে ১৯৭১ সাল। কাজেই এই আইন বাতিলের সাথে সাথে '৭১ সালের বর্ষসীমাটিও বাতিল হয়ে যাবে। বাকি থাকবে ফরেনার্স অ্যাক্ট ১৯৪৬, যাকে সামনে রেখে এজিপি তাদের পুরনো দাবি, অর্থাৎ ১৯৫১ সালকে বিদেশি চিহ্নিতকরণের বর্ষসীমা নির্ধারণ করার দাবি আদায় করতে পারবে।

'৪৬ সালের বর্ষসীমা অবাস্তব কেন?

'৪৬ সালে ব্রিটিশ শাসকেরা যখন বিদেশি চিহ্নিতকরণের আইন রচনা করে তখন চেহারা ও ভাষার নিরিখে সহজেই নির্দিষ্ট করা যেত কারা বিদেশি। পরে আসাম ও বাংলার ভূখণ্ড কেটে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গড়ে ওঠে, বর্তমানে যা বাংলাদেশ। একথা খুবই সহজবোধ্য যে, বাংলাদেশ থেকে আগত 'বিদেশি'দের ভাষা বা চেহারার নিরিখে চিহ্নিত করা বাস্তবে সম্ভব নয়। একমাত্র উপযুক্ত প্রশাসনিক ও আইনগত পদক্ষেপ ও ব্যবস্থার দ্বারাই একাজ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে যদি আইনগত ফাঁকফোকর রাখা হয় তবে জাতিদম্ভী উগ্র সাম্প্রদায়িক জিগিরের বাতাবরণ স্বভাবতই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন প্রবল উদ্বেগ ও আশঙ্কা সৃষ্টি করতে বাধ্য যে, প্রকৃত ভারতীয় হওয়া সত্ত্বেও যে কোন মুহূর্তে তাঁদের 'বিদেশি' মার্কা দিয়ে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হতে পারে। বাস্তবেও '৬৫-'৬৬ সালে আসাম পুলিশ এইভাবেই ফরেনার্স অ্যাক্ট-১৯৪৬ প্রয়োগ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হাজার হাজার প্রকৃত ভারতীয় নাগরিককে পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারী বলে জবরদস্তি দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিল। এর বিরুদ্ধে বিশাল গণবিক্ষোভ গড়ে ওঠে এবং বিক্ষোভের চাপে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কিছু বিশেষ আদেশ জারি করতে ও একাধিক ট্রাইব্যুনালও গঠন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তার কোন রক্ষাকবচ এতেও থাকেনি। সংখ্যালঘুদের উপর জবরদস্তির এই সুযোগ আছে বলেই উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীরা ফরেনার্স অ্যাক্ট ১৯৪৬ চালু রাখতে এত উৎসাহী। তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল, এই আইনকে সামনে রেখে, 'বিদেশি' চিহ্নিত করার নামে ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা নেওয়া, সঙ্কীর্ণতাবাদ উস্কে তোলা, সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালানো, দাঙ্গা বাধানো এবং প্রবল উত্তেজক পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের গদি দখলের পথ প্রশস্ত করা।

এস ইউ সি আই-এর সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব

আসাম আন্দোলনের সময়ই আমাদের দল আসাম সমস্যা সমাধানে চার দফা প্রস্তাব রেখেছিল। আমরা বলেছিলাম —

১। আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ বন্ধ নিশ্চিত করতে সবরকম ব্যবস্থা নিতে হবে,

২। সংবিধান সংশোধন করে বা সংসদে বিশেষ আইন পাশ করে রাজ্য ভাষা হিসাবে অসমীয়া ভাষার স্থান স্থায়ী করতে হবে; জনবিন্যাসের প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে একে কোনভাবেই যুক্ত করা যাবে না, সাথে সাথে ছোট বড় ভাষিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বর্তমান সাংবিধানিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে,

৩। ক্রমবর্ধমান তীব্র বেকার সমস্যার মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে আসাম রাজ্যে শিল্পবিকাশের জন্য সুনির্দিষ্ট প্যাকেজ প্রোগ্রাম ঘোষণা করতে হবে এবং

৪। ১৯৭১ সালকে সীমাবর্ষ ধরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন মেনে প্রকৃত বিদেশিদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠাতে হবে। এক্ষেত্রে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে কোনমতেই উপেক্ষা করা চলবে না।

আমরা এও বলেছিলাম, দেশের নানাস্থানের মানুষ বেশি বেশি সংখ্যায় আসামে এলে আসামের ভাষা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে, অসমীয়ারা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা হারাবে — 'আসু'র এই প্রচার অবৈজ্ঞানিক, অনৈতিহাসিক ও ভিত্তিহীন। আমরা দেখিয়েছি, নানা ভাষা, নানা সংস্কৃতির জনগণের মিশ্রণে প্রতিটি সংস্কৃতিই সমৃদ্ধ হয়। কোন সম্প্রদায়ের জনগণ অন্য সম্প্রদায়ের জনগণের সংস্কৃতি ধ্বংস করে না। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষকশ্রেণী তাদের শোষণকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য সুস্থ সংস্কৃতির উপর আঘাত হানে, তাকে ধ্বংস করে।

কংগ্রেসের দু'মুখো নীতি

আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি, আই এম ডি টি আইন বাতিলের দাবি তুলে আজ উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীরা প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করছে শুধু নয়, সমস্ত বুর্জোয়া দল সেই উত্তেজনা সৃষ্টির কাজেই সাহায্য করে চলেছে। কংগ্রেস নিজেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ত্রাতা বলে প্রচার করতে করতেই দু'নৌকায় পা রেখে চলছে। সংখ্যালঘু এলাকায় তাদের বিধায়করা সংখ্যালঘু জনগণকে স্তোক দিয়ে বলছেন, আই এম ডি টি আইন বাতিলের তাঁরা বিরোধিতা করবেন। কিন্তু বাস্তবে এই আইন বাতিলের জন্য আনীত বিলের প্রস্তুতিপর্বে তাঁরা কোনভাবেই সেই বিলের বিরোধিতা করেননি।

বরং কংগ্রেস নেতা, বর্তমান প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখার্জী আই এম ডি টি আইন রাখা না রাখার প্রশ্নের চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য গঠিত কমিটির চেয়ারম্যানের পদে বিনাদ্বিধায় বসেছিলেন। বাস্তবে কংগ্রেস সংখ্যালঘু এলাকায় এরকম বলছে আবার অসমীয়া অধ্যুষিত এলাকায় আই এম ডি টি বাতিলের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করছে না। ভেতরে ভেতরে তারা উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে বলেই প্রকাশ্যে স্পষ্ট ভাষায় এই আইন বাতিলের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিচ্ছে না। সাংবাদিকদের কাছে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের বক্তব্য রাখছে। বুর্জোয়াশ্রেণীর চিহ্নিত ও বিশ্বস্ত দল কংগ্রেসের কাছে প্রতারণা ছাড়া আর কীই বা আশা করা যায়!

এর চেয়েও উদ্বেগের বিষয় হল, আসাম রাজ্যে সিপিএম ও সিপিআইয়ের ভূমিকা। তারাও এই মারাত্মক চক্রান্তের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ বক্তব্য না রেখে 'নিরপেক্ষ' সাজার চেষ্টা করছে। এরা সংখ্যালঘুদের মন রাখার জন্য একরকম কথা বলছে, কিন্তু উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিচ্ছে না। তারা বলছে — (১) আই এম ডি টি আইন বৈষম্যমূলক। (২) বিদেশি কি বিদেশি নয় — এ প্রশ্নে প্রমাণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর না দিয়ে, অভিযোগকারীর উপর দেওয়া ঠিক হয়নি। বরং (৩) এই আইনে অভিযোগ আনার ক্ষেত্রে বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তাদের এই তিনটি বক্তব্যের সঙ্গে উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীদের বক্তব্যের মিল দেখতে পাওয়া একেবারেই কঠিন নয়। এভাবে বাস্তবে তারা 'আসু'র বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করছে, কিন্তু সংখ্যালঘু ভোট হারাবার ভয়ে সরাসরি বলছে না। তারা বলছে আইনটির সংশোধন দরকার। কিন্তু সংশোধন করে যদি নাগরিকত্ব প্রমাণের দায় অভিযুক্তের উপরেই চাপানো হয়, তবে সংশোধিত আই এম ডি টির সঙ্গে ফরেনার্স অ্যাক্ট-১৯৪৬ এর পার্থক্য থাকবে না। আইনটির মধ্যেকার সংখ্যালঘু সুরক্ষার অন্তর্বস্তুটাই বিলুপ্ত হবে।

তথাকথিত বামপন্থী ও গণতন্ত্রীদের এই ভূমিকার ফলে অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর আকার নিচ্ছে, সংখ্যালঘুদের মধ্যে গভীর আতঙ্ক ও আশঙ্কা ক্রমাগত বাড়ছে। এমন অবস্থায় কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তন ঘটেছে বলে নিশ্চিত থাকা যায় না। কারণ এই আক্রমণ কেবল সংখ্যালঘুদের উপরই আক্রমণ নয়; এ হল জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আক্রমণ, শোষিত জনগণকে বিভক্ত করে রাখার এবং সকল সম্প্রদায়ের জনগণের জীবনের সমস্ত সমস্যার মূল কারণ যে পুঁজিবাদ তাকে আড়াল করার চক্রান্ত। এ কাজ কেবল এজিপি বা বিজেপি করবে না, সরকারি ক্ষমতায় বসে যারাই পুঁজিবাদের স্বার্থ দেখবে তারাই নানাভাবে এই চক্রান্ত করবে। কাজেই পুঁজিবাদবিরোধী মানসিকতা নিয়ে সমস্ত মানুষকে এক হয়ে এর বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। শোষকশ্রেণীর এই সর্বনাশা চক্রান্ত বানচাল করার এটাই একমাত্র পথ।

বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করতে হবে

একের পাতার পর

গড়ে তোলার দরকার। সকলেই জানেন যে, গত ১৬ ডিসেম্বর '০৩ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যুৎ সচিব কর্তৃক রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কাছে লিখিত প্রস্তাবে এল টি গ্রাহকদের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে এইচ টি গ্রাহকদের দাম কমানোর উদ্দেশ্যে পেশ করা প্রস্তাব এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ২০০৩ সালে বিধানসভায় তথাকথিত পারস্পরিক ভর্তুকি ধাপে ধাপে তুলে দিয়ে অভিন্ন মাশুলনীতি চালু করার গৃহীত সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ কার্যকর করার মানসিকতাকেই প্রতিফলিত করে।

যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও তার অনুগামী কিছু সংগঠন কার্যত দামবৃদ্ধির পক্ষে ওকালতি করেছিল, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সি ই এস সি-র গ্রাহকদের ক্ষেত্রে জনরোষ লক্ষ করে এবং অদূর ভবিষ্যতে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে তারা হঠাৎই তৎপর হয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে এবং পাশাপাশি রাজ্য সরকারও বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক ঘোষিত দাম কমাবার কথা চিন্তাভাবনা করছে বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু জনগণের দাবি হল বর্ধিত দামের সম্পূর্ণ প্রত্যাহার। বর্তমান পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত দাবিগুলির ভিত্তিতে বিদ্যুৎ শ্রমিক সহ সমস্ত স্তরের শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন ও সর্বস্তরের জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী আহ্বান জানিয়েছে ঃ

(১) বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বিনাশর্তে বাতিল করতে হবে এবং এই আইন প্রণীত হওয়ার বহু আগে এই রাজ্যে বিদ্যুৎ পর্ষদ বিভাজনের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা বন্ধ করে বিভাজিত অংশগুলিকে বিদ্যুৎ পর্ষদের মূল কাঠামোয় ফিরিয়ে আনতে হবে, (২) সি ই এস সি-র গ্রাহকদের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের বর্ধিত দাম প্রত্যাহার করতে হবে এবং ইতিমধ্যে আদায়ীকৃত বকেয়াসহ বর্ধিত দাম ফেরত দিতে হবে, (৩) বিদ্যুৎ পর্ষদের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর পরিকল্পনা বাতিল করতে হবে এবং বিদ্যুতের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে চালু স্তরবিন্যাস অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে, (৪) শ্রমিক- কৃষকসহ সমাজের গরিব-মধ্যবিত্ত জনসাধারণ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কম দামে বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে গ্রহণ করতে হবে, (৫) কর্মী সংকোচন ও অর্জিত অধিকার হরণের প্রক্রিয়া বাতিল করতে হবে, (৬) সি ই এস সি-তে ভি এস এসের নামে ৪৩৮২ জন কর্মী ছাঁটাই-এর সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে এবং ইতিমধ্যে ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের মধ্যে ইচ্ছুক কর্মীদের কাজে পুনর্বহাল করতে হবে এবং (৭) চুরি-দুর্নীতি বন্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কমরেড সনৎ দত্ত ছাড়াও সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড সুনীল মুখার্জী ও কমরেড অচিন্ত্য সিন্‌হা।

ওরা মানুষকে মানুষ নয়, ভোটার হিসাবে দেখে

জলপাইগুড়ির জনসভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই-এর জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির ডাকে ১০ জুন জলপাইগুড়ি শহরের আই এম এ ময়দানে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় সভাপতিত্ব করেন দলের জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড তপন ভৌমিক এবং প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। জনসভায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক হাজার মানুষ যোগ দেন। একটি সুসজ্জিত সুশৃঙ্খল বৃহৎ মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সভায় আসে। শহরের বহু মানুষ সভায় আসেন ও মনযোগ দিয়ে বক্তব্য শোনেন।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, বিভিন্ন সরকারি দলের নেতারা যাই দাবি করুন, দেশের গ্রামশহরের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের জীবনে এমন ভয়ঙ্কর সঙ্কট ইতিপূর্বে কোনদিন আসেনি। অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি সর্বত্রই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। আর্থিক সঙ্কট তো বাড়ছেই, কিন্তু যেটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় তা হল রাজনীতির ক্ষেত্রে এই দলগুলি মিথ্যাচার, লোকঠকানো, চালাকি, ভণ্ডামি এবং ক্রিমিনালদের নিয়ে রাজনীতি করছে। তিনি বলেন, এদেশে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় রাজনীতিতে অনেক মতভেদ ছিল। সেদিন রাজনীতিতে এত চাকচিক্য ছিল না, কিন্তু বিবেক-মনুষ্যত্ব ছিল, মূল্যবোধ ছিল, দয়ামায়া ছিল, লোকের বিপদে-আপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার মন ছিল। রাজনীতিকে মানুষ শ্রদ্ধার চোখে দেখত। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন — দেশের কাজ কি সোজা কথা? একদিকে দেশ অন্যদিকে দেশসেবক, মাঝখানে আর কিছু নেই। নাম যশ নেই, বিনিময়ে প্রত্যাশা নেই, শুধু দেশের জন্য অকাতরে যে জীবন দিতে পারে সেই তো দেশসেবক। শরৎচন্দ্রের উক্তি তখনকার ছাত্রযুবকদের অনুপ্রাণিত করেছিল। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।' বলেননি, আমার কাছে এস, আমি তোমাদের চাকরি দেব, ঠিকাদারি দেব। রাজনীতির এই একটা যুগ ছিল। ব্রিটিশরা চায়নি তবু ক্ষুদিরামের মত চরিত্র জন্মেছিল। কত শত যুবক প্রাণ দিয়েছে। কীসের টানে? রাজনীতির টানেই তো! কোথায় গেল রাজনীতির সেই চরিত্র? আজ কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপি কর্মীরাই কি তাদের নেতাদের শ্রদ্ধা করতে পারেন? কারণ তাঁরা জানেন, নেতারা যা বলেন তা করেন না। জনগণও জানেন, এইসব নেতাদের কাজ হচ্ছে লোকঠকানো আর মিথ্যাচার। ফলে রাজনীতি — যা দেশকে চালাবে, সমাজকে চালাবে তার এই অবস্থা। এইসব দলের নেতাদের একটিই মাত্র লক্ষ্য — ভোট আর মন্ত্রীত্ব। ওরা মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখে না — দেখে ভোটার হিসাবে। একটা কথা এসে গেছে 'ভোট ব্যাঙ্ক'। মানুষ যে মানুষ, তার দুঃখ-ব্যথা আছে তা ওরা ভাবতে পারে না, দুঃখ-ব্যথা নিয়েও যদি একটা বক্তৃতা দেয় তার পিছনেও ক্যালকুলেশন হচ্ছে 'ভোট'।

তিনি বলেন, এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠাতা, মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের বলেছিলেন, 'বিপ্লবী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি।' মানুষকে ভালবাসতে না পারলে এ পথে আসাই চলে না। যাদের মধ্যে এটা নেই তারা বিপ্লবের ঝাণ্ডা বহন করতে পারবে না। এই মূলমন্ত্র নিয়ে আমাদের দলের শুরু। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, বিপ্লবী রাজনীতির প্রাণ উন্নত চরিত্রের মান। বলেছিলেন, একটা দল বড়, মন্ত্রী-এম এল এ অনেক, লোকজন অনেক, কিন্তু আদর্শের চর্চা নেই, চরিত্রের সাধনা নেই, সে রাজনীতি পরিবেশকে দূষিত করে। ভেবে দেখুন, ১৯৭৭ সাল থেকে সিপিএম এ রাজ্যের ক্ষমতায়। এরা নিজেদের মার্কসবাদী বলে পরিচয় দেয়। প্রকৃত মার্কসবাদী হলে এরা তো বিপ্লবের চর্চা করবে। আর বিপ্লবী রাজনীতির প্রাণ হল উন্নত চরিত্র। কিন্তু কী দেখছি আমরা? এদের এম এল এ, এম পি যত বাড়ছে সমাজের নৈতিক-সাংস্কৃতিক অধঃপতন তত বাড়ছে। চরিত্র মরছে, মনুষ্যত্ব মরছে। আমরা সবাই জানি, অবক্ষয়িত পুঁজিবাদ এই সঙ্কটের স্রষ্টা। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের রক্ষক শাসকশ্রেণী নীতিনৈতিকতা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধকে ধ্বংস করতে চাইবে, এটা স্বাভাবিক, যেমন ব্রিটিশ শাসকরাও চেয়েছিল। কিন্তু তারা পেরেছিল কি? সেদিন স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারা কর্মীরা উন্নত মূল্যবোধ ও চরিত্রের চর্চার মধ্য দিয়ে সমাজে বিরুদ্ধ শক্তির ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই পশ্চিমবঙ্গে কোথায় সিপিএমের সেই ভূমিকা? বরং এ রাজ্যে ২৭ বছরে তাদের শক্তি ও প্রভাব যত বেড়েছে, অবক্ষয় অধঃপতন আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে, যার থেকে তাদের দলের নেতা-কর্মীরাও মুক্ত নয়। এ ঘটনাই বুঝিয়ে দেয় যে, সিপিএমের রাজনীতিতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী আদর্শের কণামাত্রও নেই। বস্তুত, তাদের রাজনীতির মূল কথা এখন পুঁজিপতিশ্রেণীর সেবা করে মন্ত্রীত্ব করা। তাই নৈতিক অধঃপতনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর বদলে সিপিএম এখন ঢালাও মদের লাইসেন্স বিতরণ করে পাড়ায় পাড়ায় দোকানে দোকানে লজেন্স বিস্কুটের মত মদ বিক্রির ব্যবস্থা করছে।

তিনি বলেন, সংকট যত তীব্রই হোক, জনজীবনে যত সর্বনাশই ঘটুক, তাকে প্রতিরোধ করার মতো সুসংগঠিত গণআন্দোলন গড়েই উঠতে পারে না, যদি তা পরিচালনা করার মতো একটি যথার্থ বিপ্লবী দল উপযুক্ত শক্তি নিয়ে অবস্থান না করে। এই শক্তি কেবল সংখ্যায় নয়। সংখ্যা তো চাই-ই। কিন্তু সাথে চাই বিপ্লবী চরিত্র, আদর্শের জন্য নিবেদিত প্রাণ, উন্নত রুচি-সংস্কৃতি ও নৈতিক শক্তিতে এবং জ্ঞানের শক্তিতে বলীয়ান ছাত্র-যুব কর্মী। তাই এস ইউ সি আই জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলার পাশাপাশি কর্মীদের বিপ্লবী চরিত্র গড়ে তোলার সংগ্রাম করে যাচ্ছে। তাই যারা বর্তমান অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে মুক্তি চান, সমাজের বদল চান, বিপ্লব চান, তাদের এগিয়ে এসে এস ইউ সি আই দলকেই সর্বদিক থেকে শক্তিশালী করতে হবে, তবেই আবার গণআন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হবে।

১২ ঘন্টা মেদিনীপুর শহর বন্‌ধ

একের পাতার পর

মাহাতো সম্প্রদায়ের হাজার হাজার পরিবার জঙ্গলের কাঠ, পাতা, মধু, ফল, ফুল, পিঁপড়ের ডিম ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে মনুষ্যেতর জীবনযাপন করেন। কে কখন মারা যান কেউ তার সংবাদ রাখে না। অথচ সরকার দরিদ্র মানুষের জঙ্গল থেকে কাঠ পাতা সংগ্রহকেই আইন করে বন্ধ করে দিচ্ছে।

সর্বদলীয় কমিটি গঠন করে তদন্তসাপেক্ষে সকল অনাহার-মৃত্যুর তালিকা শ্বেতপত্র আকারে প্রকাশ ও তাদের পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া, বনাঞ্চলে কৃষিভিত্তিক শিল্পস্থাপন করে বিকল্প কর্মসংস্থান, বনাঞ্চলের গরিব মানুষের জঙ্গল থেকে কাঠ, পাতা, ফল, ফুল সংগ্রহের অধিকার বহাল রাখা ইত্যাদি দাবিতে মিছিলকারীরা আইন অমান্য করেন। পুলিশ আইন অমান্যকারীদের অফিসের গেটের মধ্যে ঢুকিয়ে ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। মহিলা কর্মীরাও সেই আক্রমণ থেকে বাদ যাননি। জেলাসম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড পঞ্চানন প্রধান সহ ২৭ জন আহত হন। চার জনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়

শান্তিপূর্ণ আইন অমান্যে বিনাপ্ররোচনায় পুলিশের এই ঘৃণ্য আক্রমণের প্রতিবাদে দলের জেলা কমিটির পক্ষ থেকে পরদিন ১৬ জুন ১২ ঘণ্টার মেদিনীপুর শহর বন্‌ধ এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ধিক্কার দিবস পালনের ডাক দেওয়া হয়। বন্‌ধের দিন সকাল থেকেই বিশাল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী হেড পোস্ট অফিস, কালেকটরেট, জজ কোর্ট, স্টেট ব্যাঙ্ক, জগন্নাথ মন্দিরচক সহ শহরের বিভিন্ন স্থানে বন্‌ধ সমর্থনকারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যাপক লাঠি চালায়। মহিলাদের কাপড় টেনে কুৎসিতভাবে গ্রেপ্তার করতে থাকে। অফিস, ব্যাঙ্ক, বাস, রাস্তা সহ যেখানেই মানুষ বন্‌ধের সমর্থনে সোচ্চার হয়, সেখান থেকেই গ্রেপ্তার করতে শহর জুড়ে শত শত পুলিশ নেমে পড়ে। সি পি এম কর্মীরা পুলিশকে নির্দেশ দিয়ে আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করায়। এমনকী ভ্যানে তোলার পরও পুলিশ তাদের মারধর করে। ৭ জন মহিলা সহ মোট ২৫ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। থানা লকআপে গুরুতর আহতদের ফেলে রাখা হয় চিকিৎসা না করে। মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত কর্মী কমরেড বংশী মণ্ডলের চিকিৎসার জন্য বলা সত্ত্বেও পুলিশ তাঁর চিকিৎসা করায়নি।

বন্‌ধের পক্ষে শহরের বিভিন্ন জায়গায় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ছিল লক্ষণীয়। পুলিশ এবং সিপিএম ক্যাডাররা জোর করে বাস চালানোর চেষ্টা করলে জগন্নাথ মন্দির স্টপে বাস অবরোধ হয়। শত শত স্থানীয় মানুষ বন্‌ধ সমর্থন করে অবরোধে সামিল হন। বহুক্ষণ অবরোধ চলে। পুলিশ লাঠিচার্জ করে বন্‌ধ ভাঙতে চাইলে জনতা পুলিশকে তাড়া করে। পরে বিরাট পুলিশবাহিনী এসে জনতার ওপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করে এবং গ্রেপ্তার করে। মেদিনীপুর জজ কোর্ট বার এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনে পুলিশী বর্বরতার নিন্দা করা হয় এবং বন্‌ধ সমর্থনে আইনজীবী ও ল- ক্লার্কগণ দলবদ্ধভাবে সমস্ত বিচারকদের কোর্ট বন্ধ রাখার জন্য অনুরোধ করেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোর্ট বন্ধ হয়ে যায়। মেদিনীপুর শহর হকার্স ও ব্যবসায়ী সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়ে বন্‌ধ পালন করেন। সকল স্কুল কলেজ পৌরসভা বন্ধ থাকে।

পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সর্বত্রই ধিক্কার দিবস পালিত হয়।

জয়নগরে বিক্ষোভ

আমলাশোলে অনাহারে ৫ জন মানুষের মৃত্যুর প্রতিবাদে এস ইউ সি আই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর শাখার উদ্যোগে ১৬ জুন জয়নগর ১নং ব্লক অফিসে এক বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দুই শতাধিক মানুষ এই সভায় হাজির হন।

সভায় আমলাশোলের ঘটনায় বামফ্রন্টের নেতা-মন্ত্রীদের অমানবিক আচরণের নিন্দা করে এবং গরিব মানুষদের ভরণপোষণের সমস্ত দায়িত্ব অবিলম্বে সরকারকে গ্রহণ করার দাবি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ অজয় সাহা, পিন্টু দাস ও সত্যজিৎ গিরি।

সভার পক্ষ থেকে তিন জনের এক প্রতিনিধি দল বিডিও'র নিকট ডেপুটেশন দেন।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

প্রবীণ সংগঠক ও জননেতা কমরেড দুর্গা দাসের জীবনাবসান

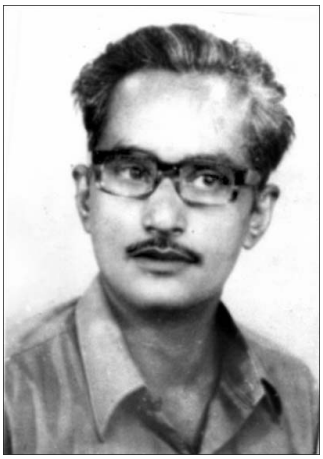

গত ৯ জুন রাত্রি ১০-২০ মিনিটে এস ইউ সি আই সিংভূম জেলা কমিটির বর্ষীয়ান সদস্য ও বিশিষ্ট জননেতা কমরেড দুর্গা দাস দীর্ঘ রোগভোগের পর জামসেদপুরের ওয়েল ভিউ নার্সিংহোমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। ১০ জুন ভোর থেকেই তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সিংভূম জেলার ধলভূমগড় অঞ্চলের নরসিংগড়ে অবস্থিত তাঁর বাড়িতে স্থানীয় আপামর জনসাধারণ এসে জমায়েত হতে থাকেন। সকাল ১০টায় কমরেড দাসের মরদেহ নিয়ে মিছিল শুরু হয়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে মিছিল নরসিংগড়ের পার্টি অফিসে পৌঁছালে সেখানে এস ইউ সি আই ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান কমরেড রণজিৎ মোদক। পার্টির সিংভূম জেলা কমিটির পক্ষ থেকে মাল্যদান করেন কমরেড রুদ্র দাস। এ আই কে কে এম এস, ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী, এ আই ডি এস ও'র পক্ষ থেকে কমরেড দাসের মরদেহে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করা হয়। সিপিআই, কংগ্রেস, জনতা দল (ইউ) প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় ক্লাব, নাট্যগোষ্ঠী, পাঠাগারসহ বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থাও মাল্যদান করে কমরেড দুর্গা দাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

১৯৫২ সালে কমরেড দুর্গা দাস ওড়িশার সম্বলপুরে চাকুরিরত অবস্থায় এ আই টি ইউ সি'র নেতৃত্বে বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে মজদুর আন্দোলনে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেন। এই আন্দোলনের ফলে তিনি চাকরি থেকে বরখাস্ত হন এবং নিজের পৈতৃক নিবাস অধুনা ঝাড়খণ্ডের ধলভূমগড়ে ফিরে আসেন। এখানে তিনি পার্টির তৎকালীন সিংভূম জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তীর মাধ্যমে এ যুগের মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের সহযোদ্ধা কমরেড হীরেন সরকারের সংস্পর্শে আসেন। কমরেড হীরেন সরকারের সান্নিধ্যে ও কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি দলের একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হন। শুরু হয় জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে তাঁর আপসহীন সংগ্রাম। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁর পরিবার এই সংগ্রাম সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। তিন মাস অত্যন্ত কষ্টকর অবস্থায় জীবনযাপন করার পর তাঁর পিতা আবার তাঁকে ঘরে আশ্রয় দেন। শুধু বাইরেই নয়, একান্নবর্তী পরিবারের অভ্যন্তরেও সকল সদস্যের মধ্যে তিনি পার্টির চিন্তাধারা নিয়ে গেছেন। এর ফলেই কমরেড দাস তাঁর ভাই-বোন-কন্যাদের পার্টির সাথে যুক্ত করেন, যাঁরা শুধু ঝাড়খণ্ডেই নয়, বর্তমানে অন্যান্য রাজ্যেও পার্টির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রয়েছেন।

পার্টি জীবনের প্রারম্ভিক অধ্যায় থেকেই তিনি এলাকার গরিব আদিবাসী জনসাধারণকে নিয়ে একের পর এক গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৫৪ সালে তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে ধলভূম গ্রেভেল খাদান মজদুর ইউনিয়ন। এই খাদান মজদুরদের সংগঠিত করে মজুরিবৃদ্ধি ও বোনাসের অধিকার মালিকদের কাছ থেকে আন্দোলনের মাধ্যমে ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হন। অন্যদিকে এই অঞ্চল গভীর জঙ্গল পরিবেষ্টিত থাকায় এলাকার বহু মানুষ জঙ্গলের সম্পদের উপর নির্ভরশীল ছিল। পরবর্তীকালে যখন বিহার সরকার আদিবাসী জনসাধারণকে এই সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে ব্যবসায়ীদের হাতে জঙ্গলকে তুলে দিচ্ছিল, সেই সময় কমরেড দুর্গা দাস তাঁর সহযোদ্ধা কমরেড অমলকৃষ্ণ ব্যানার্জীর সাথে সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করে জঙ্গলের সম্পত্তির ওপর স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকার রক্ষা করতে এবং জঙ্গলের মধ্যে পতিত জমি উদ্ধার করে এই অঞ্চলের ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করাতে সক্ষম হন।

এই লড়াইগুলির মধ্য দিয়ে কমরেড দুর্গা দাস সামন্তী সংস্কার, কূপমণ্ডুকতা ও শোষণে অভ্যস্ত আদিবাসী, হরিজন, বাগদী, বাউরিদের মধ্যে মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার আশা জাগিয়ে তোলেন ও বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি ধলভূমগড়ের দোর্দণ্ড-প্রতাপশালী রাজপরিবারের কোপে পড়েন। কিন্তু তাদের সমস্ত হুমকি উপেক্ষা করে তিনি গরিব জনসাধারণকে এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে সংগঠিত করতে থাকেন। তৎকালীন রাজার ছেলের নেতৃত্বে এক সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনী কমরেড দুর্গা দাসকে হত্যা করার জন্য তুলে নিয়ে যায়। স্থানীয় জনতা খবর পেয়ে তাঁকে উদ্ধার করে ও রাজার ছেলেকে আক্রমণ করে। ঘটনাক্রমে রাজার ছেলে মারমুখী জনতার হাত থেকে বেঁচে যান। নাহলে তার প্রাণ সংশয় হতে পারত।

এলাকার জননেতারূপে প্রতিষ্ঠিত কমরেড দুর্গা দাস সামন্তবাদী ধ্যানধারণা দ্বারা পরিবেষ্টিত এই অঞ্চলে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠতে থাকে নাট্য সংস্থা, পাঠাগার, সাহিত্যগোষ্ঠী। বিরসা মুণ্ডা-সিধু-কানু-তিলকা মাঝি-সুভাষ বোস-ভগৎ সিংয়ের জন্মজয়ন্তী, শহীদ দিবস পালন শুরু হয়। তিনি নিজে ছিলেন একজন বিখ্যাত স্পোর্টসম্যান, সব খেলায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। বহু স্পোর্টস ক্লাব তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে।

১৯৬৪ সালে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা শুরু হয়। ধলভূমগড় অঞ্চলে এই দাঙ্গার আগুনকে প্রশমিত করতে কমরেড দাস অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৭ সালে সরকারি লেভি আদায় ও চালের দামবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন গড়ে তোলেন ও বহুবার কারাবরণ করেন।

কংগ্রেসের অপশাসনের বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালে যখন জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষে ছাত্র-যুব আন্দোলন গড়ে ওঠে তখন তার প্রভাব ধলভূমগড়েও পড়ে। এই আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নেয় ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডি এস ও। সেই সময় দু'জন স্কুল ছাত্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলে কমরেড দাস তার বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষকে সংগঠিত করেন ও থানা ঘেরাও করে ছাত্রদের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য করেন।

কমরেড দাস শুধু ধলভূমগড়েই নয়, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও সংগঠন গড়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রয়াত সদস্য কমরেড প্রীতীশ চন্দের নেতৃত্বে যখন মুসাবনি অঞ্চলে তামাখনি মজুরদের বোনাসের দাবিতে আন্দোলন গড়ে ওঠে, কমরেড দাস সেখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কপার মাইনসের ব্লাস্টারদের আজীবন রাত-ডিউটির বিরুদ্ধেও আন্দোলন গড়ে ওঠে ও এই আন্দোলন উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে। ব্লাস্টারদের আজীবন রাত-ডিউটি বন্ধ হয়ে যায়। ওড়িশাতেও পার্টি গঠনের শৈশবাবস্থায় পার্টির নির্দেশে তিনি ওড়িশা যান ও সেখানে সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

এইভাবে নিরলস, কঠিন, কঠোর সংগ্রাম ও আপামর জনতার প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ ভালবাসার কারণে তিনি এই এলাকার বিশিষ্ট জননেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। দীর্ঘ রোগভোগের সময়ও তিনি পার্টির কাজকর্মের খোঁজ নিতেন ও কমরেডদের আরো এগিয়ে যাবার জন্য উৎসাহ দিয়ে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে দল বিপ্লবের প্রতি নিবেদিত প্রাণ একজন দক্ষ সংগঠককে হারাল। এই ক্ষতি সহজে পূরণ হওয়ার নয়।

কমরেড দুর্গা দাস লাল সেলাম

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি

তিনের পাতার পর

এর থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আসলে সরকারি হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত বাজারের নিয়মের সার্বভৌম প্রয়োগের যে তত্ত্ব তারা আওড়ায় তার পিছনেও একটা রাজনীতি আছে, তা হল মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার রাজনীতি। যেটা বিজেপি করেছে, কংগ্রেসও করছে এবং সিপিএম তাকে সমর্থন করছে।

বিজেপি ও কংগ্রেস দুটোই মালিকশ্রেণীর দল। একটার বদলে অন্যটা সরকারে বসলে পুঁজিপতিদের অসুবিধা হয় না, কারণ সুতোটা তাদের হাতেই থাকে। এখন সিপিএম-এর থেকেও তাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না। বরং এবার কেন্দ্রে কংগ্রেসের সমর্থনে সরাসরি সি পি এম থাকায় মালিকদের আরও সুবিধা। কারণ, কংগ্রেসের চূড়ান্ত জনবিরোধী পদক্ষেপগুলিকে জনমুখী বলে দেখাবার দায়িত্ব বামপন্থী সি পি এম নেওয়ায় মালিকরা মনে করছে, জনগণকে বিভ্রান্ত করা তাদের পক্ষে সহজ হবে। কিন্তু সিপিএমকে দিয়ে জনগণকে আর ঠকানো যাবেনা।

এ আই ডি এস ও'র পূর্বাঞ্চলীয় শিক্ষাশিবির

পাঁচের পাতার পর

সর্বভারতীয় উপদেষ্টা কমরেড প্রভাস ঘোষ। শুরুতেই কমরেড প্রভাস ঘোষ জ্ঞানচর্চা ও উন্নত চরিত্র অর্জনের সংগ্রাম কেন প্রয়োজন তা বিস্তারিত আলোচনা করেন। সারা দেশের আর্থ-সামাজিক - রাজনৈতিক - সাংস্কৃতিক সঙ্কটের ছবি তুলে ধরে তিনি বলেন, সঙ্কট জর্জরিত মানুষ আজ আশার আলো হিসাবে এস ইউ সি আই দলের দিকে বহু প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছেন। সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে হলে ছাত্র যুবকদের দায়িত্ব বিরাট।

তিনি বলেন, যৌবন মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই বয়সটাই চ্যালেঞ্জ নেওয়ার, সমাজের জন্য কিছু করার বয়স। বড় কিছু করার জন্য আত্মত্যাগের মন, স্বপ্ন দেখার মন এই বয়সেই গড়ে ওঠে। এই বয়সটা চলে গেলে শরীরে, মনে স্থবিরতা আসে। খুব কম মানুষই শরীরের বার্ধক্য সত্ত্বেও মনের যৌবন ধরে রাখতে পারেন, এ এক কঠিন সাধনা।

তিনি বলেন, জনগণের মধ্যে দলের প্রতি সমর্থন বিপুল। দলের তথা বিপ্লবী সংগ্রামের শক্তিবৃদ্ধির আজ অভূতপূর্ব সুযোগ। কর্মী-সংগঠকরা কঠোর পরিশ্রমও করছে। কিন্তু বিপুল এই সমর্থনকে সাংগঠনিক শক্তিতে পরিণত করার ক্ষেত্রে কিছু অভ্যাস ও কর্মপদ্ধতিতে আটকাচ্ছে। কমরেডদের জীবনযাত্রায় বুর্জোয়াশ্রেণীর চিন্তা ও সংস্কৃতির প্রভাব পড়ছে। যার বিরুদ্ধে সচেতন সংগ্রাম অত্যন্ত জরুরি।

নিজেদের সময়ের সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেন, আমাদের ছেলেবেলায় বাবা-মা, পাড়াপ্রতিবেশী, শিক্ষক বা দেশনেতাদের যে স্ট্যান্ডার্ড আমরা পেয়েছি, আমাদের সামাজিক মনটা তৈরি করে দিতে যা সাহায্য করেছিল, আজ সেটা নেই। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতির বিরুদ্ধে আজকের কর্মীদের লড়তে হচ্ছে।

আবার এটাও সত্য যে, এই আন্দোলনগুলি ক্রমাগত শক্তি অর্জন করছে, সমর্থন পাচ্ছে। এর প্রভাবও বিরাট। কারণ এগুলি তো শুধু অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন নয়, এও এক নতুন ভাবগত আন্দোলনের জন্ম দিচ্ছে। আন্দোলন করতে গিয়ে ব্যক্তিস্বার্থের বাইরে সামাজিক স্বার্থ নিয়ে ভাবতে হচ্ছে, বিপরীত যুক্তির বিরুদ্ধে উত্তর দিতে হচ্ছে। তার জন্য বই পড়তে হচ্ছে। আক্রমণ, লাঠিগুলির সামনে দাঁড়াতে গিয়ে নিজের মধ্যে সাহস অর্জনের সংগ্রাম করতে হচ্ছে। এগুলিই পাল্টে দিচ্ছে একটা মানুষকে। তাই আমাদের ত্রুটি, সীমাবদ্ধতা ও পরিস্থিতির অন্ধকার দিক দেখে ঘাবড়ে যাওয়ারও কিছু নেই। কমিউনিস্টরা নিজেদের ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হয়, তাকে জয় করার জন্য।

সংগঠনকে শক্তিশালী করার আবেগ ও অঙ্গীকার উচ্চারিত হয় সমস্ত প্রতিনিধির অন্তরে। নিজের সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে ওঠার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন সমস্ত প্রতিনিধি। কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত গান এবং আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শিক্ষাশিবির সমাপ্ত হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net